উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ'-গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সামনে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুবিধা। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই নতুন শিক্ষাক্রম এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে নির্বাচনভিত্তিক এই পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি. কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস. পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের পরম্পরা অনুযায়ী অন্যান্য বিদ্যায়তনিক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। এই নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। একথা বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়ে উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির এই বিদ্যায়তনিক উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

Generic Elective (History)

Course Code : GE-HI-42

Making of Contemporary World

প্রথম মুদ্রণ : আগস্ট, 2022

First Print : August, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা
Generic Elective (History)
Course Code : GE-HI-42
Making of Contemporary World

: বিষয় সমিতি :

সদস্যবৃন্দ

চন্দন বসু
Professor of History
NSOU and Chairperson, BoS

অমল দাস
Professor (Former) of History
University of Kalyani

মনোশান্ত বিশ্বাস
Professor of History
Sidho-Kanho-Birsha University

ঋতু মাথুর (মিত্র)
Associate Professor of History
School of Social Sciences, NSOU

বলাইচন্দ্র বাড়ুই
Professor (Former) of History
University of Kalyani

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History
Jadavpur University

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History
Shyamsundar College

: রচনা :

অশোক কুমার চক্রবর্ত্তী
Registrar (Former),
Institute of Historical Studies, Kolkata

: সম্পাদনা :

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History
Jadavpur University

: বিন্যাস সম্পাদনা :

চন্দন বসু
Professor of History
Netaji Subhas Open University

Generic Elective (History)

Making of Contemporary World

Course Code : GE-HI-42

পর্যায় ১ : ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং জাতীয়তাবাদ

একক-১ ❑ ঔপনিবেশবাদ এবং জাতীয়তাবাদ

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন।

- উপনিবেশ বলতে কী বোঝায়।
- উপনিবেশিক শক্তিগুলি কীভাবে উপনিবেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল।
- উপনিবেশবাদের প্রসারের কারণ কী ছিল।
- ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি কি শেষ পর্যন্ত উপনিবেশগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সমর্থ হয়েছিল। উপনিবেশবাদের অবসান কীভাবে ঘটেছিল।
- জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়।
- মার্কসীয় চিন্তাবিদরা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করতেন।

- জাতীয়তাবাদের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল।
- জাতীয়তাবাদ কীভাবে উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয় এবং এর পরিণতি কী হয়েছিল।

১.১ ভূমিকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়ন ও প্রয়োগের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। উৎপাদিত পণ্যের বাজার ও শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং মহাজনি পুঁজি বিনিয়োগ করার লক্ষ্যে পশ্চিমি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির শোষণের ফলে বেসামাল অর্থনীতি, চূড়ান্ত দারিদ্র, খাদ্য ও শিক্ষার অভাব এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতার মুখে ঔপনিবেশের জনগণের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি হয় এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদের অবসান ঘটে।

ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ইউরোপের ইতিহাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনগণ স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকলে জাতীয়তাবাদী আদর্শ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতিপ্রেমে পরিণত হওয়ায় তার রূপ উগ্র হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের মধ্যভাগে জার্মান জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং পররাজ্য গ্রাস নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

১.২ ঔপনিবেশিকতাবাদ

উপনিবেশ বা 'Colony' কথাটি থেকে ঔপনিবেশিকতাবাদ বা 'Colonialism' কথাটি এসেছে। কোনো রাষ্ট্র যখন তার সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে অন্য রাষ্ট্রে অবস্থিত ভূখণ্ডীয় এলাকাকে নিজের অধীনস্থ করে তখন ঐ অধীনস্থ এলাকাটিকে উপনিবেশ বলা যেতে পারে। ঔপনিবেশিকতাবাদ হল অন্য ভৌগোলিক এলাকার ওপর শাসন প্রতিষ্ঠা করে ক্রমশ সেখানকার অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে আনা। উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা থাকে না। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের স্বার্থ পূরণ করাই হল উপনিবেশগুলির প্রধান কাজ। মূলত ইউরোপীয় দেশগুলি প্রথম ঔপনিবেশিক শক্তি হিসাবে দেখা দেয়। এরা এশিয়া ও আফ্রিকায় সর্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়। স্পেন ও পর্তুগাল ঔপনিবেশিকতাবাদের সূচনা করলেও ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও হল্যান্ড এ ব্যাপারে শীর্ষ স্থান গ্রহণ করে। বিংশ শতকের শুরুতে বিশ্বের মোট ভূখণ্ডের প্রায় এক পঞ্চমাংশ উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল।

১.২.১ ঔপনিবেশিকতাবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

ঔপনিবেশবাদের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলির ওপর সম্যকভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য কায়েম। তবে কয়েকটি জায়গায় বিশেষত পশ্চিম এশিয়ায়, জনসাধারণ অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও কিছু মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করত। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এখানে উপনিবেশ স্থাপন

করলেও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস করেনি। কোনো কোনো রাষ্ট্র আধা ঔপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান ইত্যাদি রাষ্ট্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করলেও অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক নির্ভরশীলতার জালে এদেরকে বেঁধে ফেলা হয়েছিল। তবে যে কোনো প্রকারের উপনিবেশবাদ হোক না কেন, উপনিবেশগুলি বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে কাঁচামাল রপ্তানিকারক হিসাবে ব্যবহৃত হত। Jack Woddis-এর অভিমত হল যথেচ্ছভাবে শোষণ চালানোর উদ্দেশ্যে উপনিবেশ স্থাপনকারী রাষ্ট্রগুলি উপনিবেশগুলিতে বিভিন্ন আইনের প্রবর্তন করেছিল। এগুলি হল হরতাল বা ধর্মঘট ও শ্রমিক সংগঠনকে বেআইনি ঘোষণা করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা ইত্যাদি। এগুলির মাধ্যমে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হত।

১.২.২ উপনিবেশ বিস্তারের কারণ

ইউরোপে শিল্প বিপ্লব হওয়ায় চিরাচরিত উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন আসে। উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার জন্য প্রয়োজন ছিল বিস্তৃত বাজারের। আবার শিল্প বিপ্লবকে সফল করার জন্য প্রয়োজন ছিল কাঁচামাল ও মূলধনের। এই কারণে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির বিদেশে ভূখণ্ড দখল ও উপনিবেশ বিস্তার করা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ ছিল না। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি শিল্পে অনুন্নত হলেও কাঁচামাল ও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। ফলে অপ্রতিহতভাবে উপনিবেশবাদ তার শোষণ কায়েম করতে থাকে। পুঁজিবাদের বিকাশ ও উন্নতির জন্য এই উপনিবেশগুলি থেকে পশ্চিমি শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি কাঁচামাল আমদানি করতে থাকে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে এবং উপনিবেশগুলিকে মহাজনি পুঁজি বিনিয়োগের কাজে লাগিয়ে নিজেদের অর্থভাণ্ডারকে স্ফীত করে তোলে।

ব্রুটেন্ট্স (Brutents) ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রসারের কারণ হিসেবে উপনিবেশগুলির জনসাধারণের নির্লিপ্ততাকে দায়ী করেছেন। প্রথম থেকেই তারা ঐক্যবদ্ধভাবে ঔপনিবেশিক শক্তির আগ্রাসন প্রতিহত করতে সমর্থ হয়নি। আবার উপনিবেশগুলির জনসাধারণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হলেও তারা এই মহাশক্তিধর দেশগুলির বিরুদ্ধে কোনো মিত্র জনগোষ্ঠীর বা রাষ্ট্রের সাহায্য পেত না।

১.২.৩ উপনিবেশ বিস্তারের পরিণতি

ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের উপনিবেশগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ক্রমশ তাদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব করে এবং শোষণ চালিয়ে নিজেদের সম্পদ যেমন বাড়িয়েছিল তেমনি উপনিবেশগুলির অর্থনীতি একেবারে বিপর্যস্ত হয়েছিল। উপনিবেশগুলির আর্থিক উন্নয়নের দিকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কোনো নজর ছিল না। শোষণই ছিল তাদের একমাত্র লক্ষ্য।

তবে এই অবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি। বেসামাল অর্থনীতি, চূড়ান্ত দারিদ্র, খাদ্য ও শিক্ষার অভাব এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতার মুখে ঔপনিবেশের জনসাধারণের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি হয়। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লব ও সাম্যবাদী সরকার উপনিবেশের জনগণের মধ্যে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অনুভূতির সঞ্চার করে। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান উপনিবেশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। উভয়েই মহাশক্তির মর্যাদা লাভ

করার জন্য উপনিবেশের অবসান ঘটিয়ে সেখানকার জনগণকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশের জনগণ উপলব্ধি করে যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রাম করলে ঔপনিবেশিক শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বার্মা ও ফিলিপিন স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতে স্বাধীনতা আসে। উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন শুরু হয়। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, চিন প্রভৃতি রাষ্ট্র একে একে স্বাধীনতা অর্জন করায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উপনিবেশবাদের অবসান ঘটে।

১.৩ জাতীয়তাবাদ : সংজ্ঞা

জাতীয়তাবাদের ধারক রাজনৈতিকভাবে স্বীকৃত একটি জাতি। জাতি হল ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রীয় জনগোষ্ঠী যারা অন্য একটি রাষ্ট্রীয় জনগোষ্ঠী থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র সম্বন্ধে সচেতন। চেতনা থেকে আসে জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদ তৈরি করে জাতিস্বত্তা। ধর্ম, ভাষা, রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রভৃতি বহু উপাদানই জাতি গঠনে সহায়তা করে। রেনাঁর মতে জাতি হল এক-আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে আবদ্ধ জনসম্প্রদায়। রেনাঁ জাতিত্বের দুটি শর্ত আরোপ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় জনগোষ্ঠীর সনাতন ঐতিহ্য ও তার পরম্পরা এবং প্রতিবেশী জনগোষ্ঠীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী হয়ে টিকে থাকার জন্য ঐক্যের অদম্য আগ্রহের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কতকগুলি মানসিক গুণ যেমন সমমানসিকতা, সহমর্মিতা এবং বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন একটি জনগোষ্ঠীকে একক জাতিরূপে ঐক্যবদ্ধ থাকতে সক্ষম করে।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী কোনো জনসমষ্টি যদি তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারক হয় এবং ভাষা, ধর্মের দিক থেকে অভিন্ন থাকে এবং নানা বৈচিত্রের মধ্যেও মূলগত ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে তবে তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হয়। জাতিগত চেতনা থেকে জন্ম নেয় জাতীয়তাবাদ।

তবে অখণ্ড ভূখণ্ড, ভাষাগত ঐক্য, প্রথাগত বৈশিষ্ট্য সাধারণ সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতা, প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা, একই রাষ্ট্রের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য, জাতীয় স্বার্থের স্বপক্ষে কাজ, জাতীয় নীতির সাফল্য কামনা, বিদেশি শত্রুর প্রতি বৈরী মনোভাব প্রভৃতি জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির সবকটি না থাকলেও জাতিত্বের শর্তগুলি পূরণ করা সম্ভব। ভাষা, ধর্ম ও রাজ্যসীমার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় চেতনা বা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। ভাষাগত, ধর্মগত, কৃষ্টিগত, প্রথাগত বিভিন্নতা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গড়ে ওঠেছিল। ইউরোপের অনেক দেশে বিভিন্ন পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল।

১.৩.১ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি

প্রাথমিক পর্যায়ে কার্ল মার্কস এবং এঞ্জেলস্ সাধারণ অর্থে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা শ্রেণি সংগ্রামের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জাতিত্ব বা জাতিতত্ত্ব তাঁদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। জাতীয় চরিত্র প্রসঙ্গ মার্কস ও এঙ্গেলস্-এর রচনায় এসে গেলে ও তাঁরা 'জাতীয়তাবাদ' অপেক্ষা সামাজিক শ্রেণি সম্পর্ক বিষয়েই অধিক আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের মতে, অনেক জাতিই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়ে যায়। দ্রুত

শিল্পায়নের ফলেই তা ঘটে থাকে। কিন্তু সব সভ্য দেশগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ করা হল মার্কসীয় সর্বহারা আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য।

মার্কস্ তাঁর *The Communist Manifesto*-তে বলেন, 'শ্রমজীবী মানুষের কোনো দেশ নেই, শ্রমজীবী মানুষের কোনো জাতি নেই, তারা সমগ্র শ্রমজীবী শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত—এই তাদের মূল পরিচয়'। গোড়ার দিকে মার্কসীয় চিন্তাবিদরা জাতীয়তাবাদী ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাঁরা সর্বহারা শ্রেণির একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু মার্কসীয় চিন্তাবিদদের অনেকেই পরবর্তী সময়ে জাতিরাষ্ট্র সম্পর্কে ধারণার পরিবর্তন ঘটান। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অধিকাংশ অস্ট্রো-মার্কসীয় চিন্তাবিদগণ মনে করতেন যে সর্বহারা শ্রেণির বিকাশের স্বার্থেই জাতি, জাতিত্বের ও জাতীয়তাবাদের একটা প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লেনিনের মতে, সমাজতন্ত্রের নিদর্শন হল সব জাতি ও ব্যক্তিকে একই পরিবারের ঐক্যে আবদ্ধ করা। এটি বাস্তবায়িত করতে হলে প্রত্যেককে তার নিজস্ব মত ও পথ অনুযায়ী চলতে দেওয়া প্রয়োজন। তাই লেনিন এশিয়ার মুক্তিকামী আন্দোলনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

১.৩.২ জাতীয়তাবাদের উদ্ভব

বিশেষ অর্থে জাতীয়তাবাদ উনিশ শতকের সন্তান। ফরাসি বিপ্লবের বড় অবদান হল জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। জনগণের সার্বভৌমত্বের জ্যাকোবিন তত্ত্বটি ছিল দ্বিমুখী। একদিকে রাজার বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণের দাবি, সরকারের রূপদানের এবং সরকার পরিচালনায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠাই যার লক্ষ্য ছিল। অন্যদিকে তাদের মত হল, সরকার হবে জনগণের বক্তব্য ভিত্তিক। এর অর্থ হল এই যে, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে সম্পদ বা মর্যাদা নির্বিশেষে নাগরিকের সমান বক্তব্য প্রকাশের অধিকার সুনিশ্চিত করা। ফরাসি বিপ্লবের স্বাধীনতার বাণী জাতীয়তাবাদের মধ্যে পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। বিপ্লবের সময় থেকে জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদের অভ্যুদ্বয় ইউরোপের ইতিহাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। ইউরোপের জাতীয়তাবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র ও প্রসার লাভ করেছিল। নেপোলিয়নের কার্যকলাপ ও ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিসমূহ জাতীয়তাবাদ ও ইউরোপের দেশগুলির স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপন্থী ছিল। স্পেন ও জার্মানীতে নেপোলিয়নের প্রবর্তিত শাসন অত্যন্ত ঘৃণার সঞ্চার করেছিল। তবে নেপোলিয়ন জার্মানীকে ৩৯টি রাষ্ট্রে ভাগ করার ফলে জার্মানীর জাতীয়তাবাদের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। একইভাবে ইতালীতে ও নানা সংস্কারের মাধ্যমে তিনি সেখানকার জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন।

১.৩.৩ জাতীয়তাবাদের ত্রুটি

জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনগণ স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকলে জাতীয়তাবাদী আদর্শ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতিপ্রেমে পরিণত হলে তার রূপ উগ্র হয়ে ওঠে এবং এই উগ্র জাতীয়তাবাদ অনেক সময় আক্রমণাত্মক রূপ ধারণ করে, সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। এখানে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক লালসা বড় হয়ে দেখা দেয়, উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রসার লাভ করে। উনিশ শতকের শেষে এবং কুড়ি শতকের মধ্যভাগে জার্মান জাতীয়তাবাদ

সংকীর্ণ উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং পররাজ্য গ্রাস নীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। ফ্রান্স জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক স্বার্থে 'স্বাভাবিক সীমান্তের' প্রসারণের চেষ্টা করেছে। জার্মানরা উনিশ শতকে সমগ্র মধ্য ইউরোপের ওপরে আধিপত্য দাবি করেছিল। তাদের মনে হয়েছিল, পশ্চিমের মিউজ থেকে পূর্বে মেমেল, দক্ষিণের আডিজ থেকে উত্তরের বাল্টিক সাগর পর্যন্ত সবই তাদের। বিংশ শতকের মধ্যভাগে হিটলারের জার্মানি এসবই গ্রাস করে নিয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলনের নেতা বিসমার্ক জার্মানীকে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে ঐক্যবদ্ধ জার্মান রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলেননি। প্রুসিয়ার ধনতন্ত্রীদের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি সামরিক কৌশলে একটি বুর্জোয়া জাতিরাষ্ট্র গঠন করেছিলেন। তারপর জোর পূর্বক চাপিয়ে দিয়েছিলেন জার্মান একরূপত্বের ধারণা। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলেও উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর জাতিস্বত্তা বিরোধের নিস্পত্তি হয়নি। একইভাবে পিডমন্টের নেতা কাভুরের সামরিক ও কূটনৈতিক কৌশলে যেভাবে ইতালি ঐক্যবদ্ধ জাতিরাষ্ট্রে পরিণত হয়, তা আসলে শিল্পোন্নত উত্তর ইতালির হাতে স্বল্পোন্নত কৃষিজীবী দক্ষিণ ইতালির রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ। প্রকৃত অর্থে জাতীয় ঐক্য তাতে অর্জিত হয়নি। উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বজায় ছিল। আন্তোনিও গ্রামশি লিখেছিলেন, ইতালিতে সাংস্কৃতিক অনৈক্যের সঙ্গে রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য গুলিয়ে গিয়েছিল, এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে বিদেশি বলে মনে করত। অবশ্য এই দ্বৈততার প্রভাব জার্মানি ও ইতালি, উভয় দেশের আচরণে পড়েছিল।

১.৪ উপসংহার

উপনিবেশবাদের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধীনস্থ রাষ্ট্রগুলির ওপর সম্যকভাবে রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য কায়েম করা হলেও কয়েকটি জায়গায় বিশেষত পশ্চিম এশিয়ায় জনসাধারণ অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকলেও কিছু মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করত। তবে সব ধরনের উপনিবেশগুলি থেকে সম্পদ সংগ্রহ করে এবং উপনিবেশগুলিকে মহাজনি পুঁজি বিনিয়োগের কাজে লাগিয়ে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি নিজেদের অর্থভাণ্ডারকে স্ফীত করত। তবে এই ব্যবস্থা স্থায়ী হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঔপনিবেশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। উপনিবেশবাদের অবসান ঘটে।

জাতীয়তাবাদ জন্ম নেয় জাতিগত চেতনা থেকে, তবে ভাষা, ধর্ম ও রাজ্যসীমার পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও অনেক দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জাতীয় চেতনা বা জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। ফরাসি বিপ্লবের সময় জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের উন্মেষ ও জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ইউরোপের ইতিহাসের একটি বড় বৈশিষ্ট্য। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনগণ স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণ সাধনে নিয়োজিত থাকলে জাতীয়তাবাদী আদর্শ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে সহায়ক হয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ জাতিপ্রেমে পরিণত হওয়ায় তার পরিণাম শুভ হয়নি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলেও উত্তর ও দক্ষিণ জার্মানীর জাতিস্বত্তা বিরোধের নিস্পত্তি হয়নি। উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বজায় ছিল।

১.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝায়?

২। ঔপনিবেশবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

৩। ঔপনিবেশবাদ কী কারণে প্রসার লাভ করেছিল?

৪। জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা দিন।

৫। জাতীয়তাবাদের উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল?

৬। উগ্র জাতীয়তাবাদ বলতে কী বোঝায়?

১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক,* কলকাতা, ২০০৬।

২। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)* কলকাতা, ২০০৫।

৩। Peter Calvocoressi—*World Politics Since 1945,* Latest Edition, England, 2009.

একক-২ ❑ অব-ঔপনিবেশায়ন : কারণ এবং অব-ঔপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কালে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যেমন ব্রিটেন, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, স্পেন প্রভৃতি নানা কারণে তাদের ঔপনিবেশগুলির ওপর অধিকার বজায় রাখতে পারেনি। এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার যে সব দেশ পশ্চিমি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল তারা স্বাধীনতা লাভ করে।
- ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৬৬টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সবক্ষেত্রে এক প্রকার হয়নি। ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন ধারায়।

২.১ ভূমিকা

অব-ঔপনিবেশায়ন হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অপ্রতিহতভাবে শোষণ করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। এর বিরুদ্ধে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার যে সব দেশ যে সব পশ্চিমি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল তারা স্বাধীনতা লাভের জন্য সচেষ্ট হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ঔপনিবেশিক

রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিবর্তিত হয়। শেষ পর্যন্ত নানা কারণে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যে প্রায় সব কটি দেশই স্বাধীনতা লাভ করে। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সবক্ষেত্রে এক প্রকার হয়নি।

২.২ অব-ঔপনিবেশায়ন : কারণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্বের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। এর ফলে এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকার যে সব দেশ পশ্চিমি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিল তারা স্বাধীনতা লাভ করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ব্রিটেনের অধিকৃত অঞ্চল ছিল সবচেয়ে বেশি। এর পর ছিল ফ্রান্সের স্থান। অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে ছিল হল্যান্ড, বেলজিয়াম এবং স্পেন। এই সব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে তাদের সাম্রাজ্য হারায়।

ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রে ইউরোপীয় দেশগুলি অপ্রতিহতভাবে উপনিবেশগুলিকে শোষণ করে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছিল। এর পরিণতিতে একদিকে যেমন বেসামাল অর্থনীতি, চূড়ান্ত দারিদ্র, খাদ্য ও শিক্ষার অভাব এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতার মুখে ঔপনিবেশের জনসাধারণের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ তৈরি হয়, তেমনি অপরদিকে পশ্চিম ইউরোপের বিশেষ করে ব্রিটেনের বহু প্রগতিশীল মানুষ এই ধরনের শাসন মেনে নিতে পারেনি। ব্রিটেনের উদারনৈতিক শিক্ষার দ্বারা আলোকিত প্রগতিশীল মানুষেরা ঔপনিবেশবাদের বিরোধিতা করেছিল। জনমত ক্রমশ ঔপনিবেশবাদের বিরোধী হয়ে উঠলে ইংল্যান্ডের গণতান্ত্রিক সরকার ঔপনিবেশবাদের অবসানের লক্ষ্যে ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণে অগ্রসর হয়। পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবীসহ সাধারণ মানুষ ঔপনিবেশবাদকে গ্রহণ করতে পারেননি। ঔপনিবেশের অবসানের জন্য তারা সোচ্চার হয়েছিল। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি এই জনমতকে উপেক্ষা করতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঔপনিবেশবাদের অবসান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে কাজ করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি জয়লাভ করলেও সামরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে ঔপনিবেশগুলি রক্ষা করার আগ্রহ তাদের ছিল না। যুদ্ধের পর পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী নিজেরাই মার্কিন সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা ঔপনিবেশবাদের অবসানে সহায়ক হয়েছিল। মার্কসীয় চিন্তার আবির্ভাব ও প্রসার ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে রুশ বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদী সরকার ঔপনিবেশের জনগণের মধ্যে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিপ্লবী অনুভূতির সঞ্চার করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান ঔপনিবেশবাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। উভয়েই মহাশক্তির মর্যাদা লাভ করার জন্য ঔপনিবেশের অবসান ঘটিয়ে সেখানকার জনগণকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল। তাই ঔপনিবেশগুলিতে যখন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম শুরু হয়েছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল।

বিশ্বশান্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের সৃষ্টি ঔপনিবেশবাদের পক্ষে অনুকূল হয়নি। ঔপনিবেশবাদের অবসানের জন্য রাষ্ট্রসংঘ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। রাষ্ট্রসংঘের সনদে ঔপনিবেশগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেওয়ার কথা ছিল। রাষ্ট্রসংঘের সনদে বলা হয়েছিল—*'All peoples have the right to self determination, by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.'* এই সঙ্গে আরও বলা হয়, *'The subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation, which included colonialism, was declared a crime against international law'*. বহু রাষ্ট্র এর সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল।

ভারতের নেতৃত্বে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন ঔপনিবেশবাদের অবসানে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ নেতারা ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনকে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছিল। মূলত তৃতীয় বিশ্ব গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশবাদের অবসানের সূত্র ধরে।

২.৩ অব-ঔপনিবেশায়নের প্রক্রিয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে যখন পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামরিক বিপর্যয় ঘটে, তখন এই জাতীয়তাবাদী আন্দেলনগুলি আরও শক্তিশালী হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চাপে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী নীতি পরিবর্তিত হতে থাকে।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ৬৬টি দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভারতবর্ষ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, মালয়, সাইপ্রাস, গোল্ডকোস্ট, নাইজেরিয়া, সিয়েরালিয়ন, ভিয়েতনাম, আলজেরিয়া, মরক্কো, গাম্বিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, রোডেশিয়া, মোজাম্বিক প্রভৃতি। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সবক্ষেত্রে একপ্রকার হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া ছিল শান্তিপূর্ণ, অন্য অনেক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া হিংসার মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়েছিল। তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই দেখা যায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেন অখণ্ডিত ভারতকে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারেনি। ভারত বিভাজনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। হিংসাত্মক ঘটনাবলী ভারত বিভাজনকে ত্বরান্বিত করেছিল। বাস্তুচ্যুত হয়েছিল বহু মানুষ। মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকায় যে নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাব ঘটল তাদের ভৌগোলিক সীমান্ত অনেক সময় ঐ অঞ্চলের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের পরিপন্থী ছিল। এর পরিণতিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সংকটের আবির্ভার ঘটে।

২.৩.১ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

১৯৫০-৬০-এর দশক ছিল নতুন নতুন জাতিরাষ্ট্র গঠনের এবং অব-ঔপনিবেশিকতার দশক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশিকতার সমাপ্তি ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন ধারায়। আমেরিকা ও ব্রিটেনের ঔপনিবেশিগুলিতে ক্ষমতার হস্তান্তর যতটা সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছিল, ফরাসি বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশে তা

হয়নি। শ্রীলঙ্কা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এবং বার্মা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। ঐ বছরেই মালয়কেও স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত ছিল ব্রিটেন, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং সংখ্যালঘু চিনা মালয়ীদের ভেতর লড়াই ক্ষমতার হস্তান্তরকে আরও এক দশক পিছিয়ে দিয়েছিল। বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছিল এক দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন। কমিউনিস্টদের অপসারিত করে মালয়ী ও চিনা অভিবাসী নেতারা সমঝোতায় রাজি হয়েছিল ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম নিয়েছিল মালয় যুক্তরাজ্য। সিঙ্গাপুর ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হয় ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে, বোর্নিও ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে, মালয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে গড়ে ওঠে মালয়েশিয়া। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাইয়ে ওলন্দাজদের সঙ্গে ইন্দোনেশীয়দের সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা পিছু হটে, ইন্দোনেশীয় যুক্তরাজ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়।

২.৩.২ আফ্রিকা

বিশাল মহাদেশ আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল অনেক, আফ্রিকার ভাগাভাগিও ছিল নানা দিকে, ভূমধ্যসাগরীয় উত্তর আফ্রিকা, উপ-সাহারীয় অঞ্চল, পূর্ব-মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। এত বিস্তৃতির কারণেই আফ্রিকার অব-ঔপনিবেশিকতার পর্যায়কাল ও ধরন ছিল ভিন্ন ভিন্ন।

সাইরেনাইকা-ট্রিপোলিটেনিয়া, ফ্যাজান—এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল লিবিয়া। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ইতালি লিবিয়া, এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যান্ডের ওপর থেকে তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারির মধ্যে লিবিয়াকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ২৯ মার্চ লিবিয়ায় Provisional Federal Government বসানো হয়েছিল। নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ৭ই অক্টোবর এবং ২৪ ডিসেম্বর ঘোষিত হয়েছিল United Kingdom of Libya-র স্বাধীনতা।

বেশ কিছু আফ্রিকান কলোনিতে জাতিদাঙ্গার সমস্যা ছিল। তার কারণ ছিল শ্বেতাঙ্গদের বহু সংখ্যায় বসতি স্থাপন, যেমন ট্যাঙ্গানাইকায়, নাইজিরিয়ায়, উগান্ডায়, কিনিয়ায় প্রভৃতি। ব্রিটেন ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ট্যাঙ্গানাইকাকে স্বাধীনতা দেয়। উগান্ডা স্বাধীনতা পায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কিনিয়া এবং উত্তর রোডেশিয়া। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ লড়াই-এর পর দক্ষিণ রোডেশিয়া স্বাধীন জিম্বোবোয়ে রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

ফরাসি ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ ফ্রান্স মরোক্কোর স্বাধীনতা স্বীকার করে। ঐ একই বছরে স্বাধীন হয় টিউনিসিয়া। মরক্কো ও টিউনিসিয়া ছিল ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য। কিন্তু আলজিরিয়া ছিল পুরোপুরি ঔপনিবেশ। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে আলজিরিয়া স্বাধীন হয়। এই সময় বেলজিয়াম সরে এসেছিল কঙ্গো থেকে, কিন্তু অ্যাঙ্গোলা বা মোজাম্বিক থেকে পর্তুগাল অত সহজে সরেনি। পর্তুগাল বহুদিন পর্যন্ত তার সাম্রাজ্যবাদ প্রক্রিয়া অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের অ্যাঙ্গোলার বিদ্রোহ ও ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মোজাম্বিকের আন্দোলন দমিয়ে রেখেছিলেন পর্তুগালের স্বৈরাচারী শাসক অলিভেরা সালাজার। কিন্তু তিনি নিজেই ক্ষমতা হারান ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন হয় অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিক।

২.৪ উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে নানা কারণে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জয় লাভ করলেও সামরিক ও আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ায় ঔপনিবেশগুলি রক্ষা করার আগ্রহ ছিল না। এছাড়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত রাশিয়ার ইতিবাচক ভূমিকা, বিশ্বশান্তিকে আটুট রাখার জন্য রাষ্ট্রসংঘের অব-ঔপনিবেশায়নের প্রতি সমর্থন, জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন ইত্যাদি নানা কারণে অব-ঔপনিবেশায়ন ত্বরান্বিত হয়।

তবে এই প্রক্রিয়া সবক্ষেত্রে এক প্রকার হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া ছিল শান্তিপূর্ণ, আবার অনেক ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া হিংসার মাধ্যমে ফলপ্রসূ হয়েছিল। আবার অনেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক সীমানার পরিবর্তন ঘটেছিল।

২.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। অব-ঔপনিবেশায়নের কারণগুলি ব্যাখ্যা করুন।

২। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি কীভাবে তাদের ঔপনিবেশগুলিকে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল?

২.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

২। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)* কলকাতা, ২০০৭।

৩। মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়—*সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০২০।

একক-৩ ❑ আফ্রো-এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-ঔপনিবেশায়ন

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- এশিয়ার জাতীয় আন্দোলন ছিল সাধারণত শহরকেন্দ্রিক। আন্দোলনে কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা ছিল না। আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতার মিশ্রণ ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা অনুযায়ী ১৪ এবং ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মধ্য দিয়েই এই উপমহাদেশে ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটে।
- দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়ায় ঔপনিবেশিকতার সমাপ্তি ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন ধারায়। আমেরিকা ও ব্রিটেনের ঔপনিবেশগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তর অনেকটা সুশৃঙ্খলভাবে হলেও ফরাসি বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশে তা হয়নি।
- বিশাল মহাদেশ আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল অনেক। এত বিস্তৃতির কারণে আফ্রিকার অব-উপনেবিশায়নের পর্যায়কাল ও ধরন ছিল ভিন্ন।

- ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হলেও সংখ্যালঘু ইংরেজদের হাতে শাসনভার থেকে গিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ সরকার বর্ণবিদ্বেষকে তাদের শাসনের মূল বিষয়ে পরিণত করে। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পায়।

৩.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিকশিত হয় এবং প্রায় দু-দেশের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ঔপনিবেশ স্বাধীন হয়। ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটে। ঔপনিবেশের জনগণ উপলব্ধি করে যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম অব-ঔপনিবেশায়নের সহায়ক। বেসামাল অর্থনীতি, দারিদ্র, খাদ্য ও শিক্ষার অভাব এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতার মুখে ঔপনিবেশের জনসাধারণের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ঔপনিবেশগুলিতে বিভিন্ন পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশগুলি সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। তবে অব-উপবেশিকতার পর্যায়কাল ও ধরন ছিল ভিন্ন।

৩.২ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও অব-ঔপনিবেশায়ন

৩.২.১ এশিয়া : আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হলেও এই আন্দোলনের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল সাধারণত শহরকেন্দ্রিক। রাজনীতির দিক থেকে সচেতন ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কৃষক শ্রমিকসহ সাধারণ মানুষ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। আন্দোলনে কোনো সুনির্দিষ্ট পন্থা ছিল না। আন্দোলন এককভাবে শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়নি। আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতার মিশ্রণ ছিল।

৩.২.২ ভারত

ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন টিকে ছিল প্রায় দু-শো বছর। অল্প কয়েকজন ইংরেজ ভারতীয় আমলাদের কাজে লাগিয়ে ইউরোপীয় শাসনের দাপটকে ভাবগত দিক থেকে স্বতঃসিদ্ধ করে দিয়েছিল। বিশ শতকে এসে ইংরেজরা আর তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। বেসামাল অর্থনীতি, দারিদ্র, খাদ্য ও শিক্ষার অভাব এবং রাজনৈতিক স্বৈরাচারিতার মুখে, ঔপনিবেশের জনসাধারণের মধ্যে ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মধ্যবিত্তরা যাদের ইংরেজরা সহযোগী বন্ধু শ্রেণি হিসাবে ভেবেছিল, তারা ও স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় কর্মচারীরা আর ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য দেখায়নি। এই পরিস্থিতিতে শাসনে বেঁধে রাখার ইচ্ছা বা শক্তি, কোনটাই আর ব্রিটিশ সরকারের ছিল না।

স্ট্রাফোর্ড ক্রিপস-ও মন্তব্য করেছিলেন, ব্রিটেন ভারত ছেড়েছে, কারণ আই.সি.এস ও পুলিশ, কোনোটাই আর ব্রিটিশের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই ব্রিটেন ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চ-এ সেই উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট মিশন পাঠায়। ক্ষমতা হস্তান্তরের ধরন আর সাংবিধানিক নীতি সম্পর্কে যে প্রস্তাব মিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল, তাতে ভারতের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল, জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ, কেউই পছন্দ করেনি। যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়, তা স্থায়ী হয়নি। ইতিমধ্যে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিণতি হল দেশভাগ।

১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মার্চ-এ লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লিগ মুসলমান প্রধান অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের কথা বলেছিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর ডাক দেওয়া হয়েছিল পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্যে। দেশভাগ সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে ভাল উপায় ভেবে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে মাউন্টব্যাটেন দেশভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ এবং ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত—এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের মধ্য দিয়েই এই উপমহাদেশে ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটে।

৩.২.৩ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঔপনিবেশিকতার সমাপ্তি ঘটেছিল ভিন্ন ভিন্ন ধারায়। আমেরিকা ও ব্রিটেনের ঔপনিবেশগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তর অনেকটা সুশৃঙ্খলভাবে হলেও ফরাসি বা ওলন্দাজ ঔপনিবেশে তা হয়নি। শ্রীলঙ্কা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে এবং বার্মা ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এই বছরেই মালয়কে ও ব্রিটেন স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান এবং চিনা মালয়ীদের মধ্যে লড়াই ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে আরও এক দশক পিছিয়ে দিয়েছিল। এক দশকের কমিউনিস্ট আন্দোলন বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছিল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে মালয় স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে জন্ম নিয়েছিল। সিঙ্গাপুর ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হয়েছিল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বোর্নিও স্বাধীন হয়েছিল, মালয়ের সঙ্গে মিশে গিয়ে গড়ে তুলেছিল বর্তমানের মালয়েশিয়া।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিনস্রে স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিলে ও হল্যান্ড ও ফ্রান্স সহজে তাদের ঔপনিবেশগুলি থেকে সরে আসতে রাজি হয়নি। এর ফলে ইন্দোনেশিয়াতে হল্যান্ডের বিরুদ্ধে এবং ইন্দো-চিনে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। জাপানের আত্মসমর্পণের পর সুকর্নের নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ১৭ আগস্ট স্বাধীনতা ঘোষণা করে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু হল্যান্ড এই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করায় হল্যান্ডের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়ায় শুরু হয়েছিল রক্তাক্ত সংগ্রাম। বিশ্বের নানা দেশ এবং রাষ্ট্রসংঘ হল্যান্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করায় ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ ডিসেম্বর ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার হাতে শাসন ক্ষমতা তুলে দিতে বাধ্য হয়। স্বাধীন United States of Indonesia-র প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সুকর্ণ নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মেকং অববাহিকার কম্বোডিয়া-ভিয়েতনাম ছিল ফরাসি ইন্দো-চিন ঔপনিবেশ। প্রথমে ফরাসি তারপর জাপান এই দুই বিদেশি শাসনের অধীনে থাকার অভিজ্ঞতা থেকেই ইন্দো-চিনের জাতীয়তাবাদের বিকাশ

ঘটে। ইন্দো-চিনের গেরিলা বাহিনীর প্রতিরোধ ছিল একদিকে ফরাসি সরকারের পুরোনো শোষণনীতি আর অন্যদিকে জাপানি জঙ্গিশাসনের বিরুদ্ধে।

ইন্দো-চিনের 'স্বাধীনতা লিগ'-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে। এর মধ্যে অনেকগুলি দল ছিল। যেমন 'জাতীয় দল', 'নবীন আনাম দল', 'যুবক লিগ', 'কিষাণ সংঘ', 'জাতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন' ইত্যাদি। 'স্বাধীনতা লিগ' জাপানিদের বিরুদ্ধে একদিকে তীব্র আন্দোলন শুরু করে, অন্যদিকে তারা ফরাসি রেসিডেন্ট গভর্নর এ্যাডমিরাল ডেক্যুর জাপ তোষণের সমালোচনা করতে থাকে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানের আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গেই আনামের নাম মাত্র সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন।

ইন্দো-চিনের স্বাধীনতা যুদ্ধে ফ্রান্স বিধ্বস্ত হয়ে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জেনেভা চুক্তির দ্বারা ইন্দো-চিনের তিনটি রাজ্যের ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়ার স্বাধীনতাকে স্বীকার করে। জেনেভা সম্মেলনে ভিয়েতনামকে ১৭° রেখার ভিত্তিতে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামে ভাগ করা হয়েছিল। দক্ষিণ ভিয়েতনাম মার্কিন প্রভাবাপন্ন হয়ে পড়েছিল। উত্তর ভিয়েতনাম ছিল কমিউনিস্টদের দখলে। কমিউনিস্ট নেতা হো-চি-মিন দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রভাব বিস্তার করবে এই আশঙ্কা মার্কিনীদের ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে কমিউনিস্টদের উচ্ছেদ করা ছিল মার্কিনীদের লক্ষ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লাওস ও কাম্বোডিয়ার অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে-ও হস্তক্ষেপ করে। সোভিয়েত রাশিয়া ও গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের সাহায্যে কমিউনিস্টরা এখানে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ভিয়েতনামের জাতীয় আন্দোলন সফল হয় যদিও ভিয়েতনামে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি আসেনি।

৩.৩ আফ্রিকা

বিশাল মহাদেশ আফ্রিকায় ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল অনেক। আফ্রিকা ছিল নানা দিকে বিভক্ত যেমন ভূমধ্যসাগরীয় উত্তর আফ্রিকা, উপ-সাহারীয় অঞ্চল, পূর্ব-মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আফ্রিকা। এত বিস্তৃতির কারণে আফ্রিকার অব-উপনেবিশকতার পর্যায়কাল ও ধরন ছিল ভিন্ন।

লিবিয়া ছিল সাইরেনাইকা, ট্রিপোলিটেনিয়া, ফ্যাজান—এই তিনটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ইতালি লিবিয়া, এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যান্ডের ওপর থেকে তার স্বত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ২৯ মার্চ লিবিয়ায় বসানো হয়েছিল Provisional Federal Government, ৭ই অক্টোবর নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল এবং United Kingdom of Libya-র স্বাধীনতা ঘোষিত হয়েছিল ২৪ ডিসেম্বর। রাজা হয়েছিলেন সাইরেনিকার আমির প্রথম ইদ্রিস। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ১৪ ডিসেম্বর লিবিয়াকে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যপদ দেওয়া হয়েছিল।

ইতালি ছাড়া ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ আফ্রিকার বিভিন্ন অংশ দখল করে ঔপনিবেশ স্থাপন করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের চাপে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন তার ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। সুদান স্বাধীন হয় ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। ব্রিটিশ উপসাহারীয় এলাকায় গোল্ড কোস্টে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন কউম নক্রুমা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র থেকে স্বদেশে ফিরে এসে স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। Convention of People's Party নামক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে নক্রুমার জাতীয়তাবাদী দল বিপুলভাবে জয় লাভ করেছিল। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার গোল্ড কোস্টকে স্বাধীনতা দেয়। স্বাধীনতার পর গোল্ড কোস্ট 'ঘানা' নামে পরিচিত হয়। স্বাধীন ঘানার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নক্রুমা কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী আক্রায় নক্রুমা আফ্রিকার নেতাদের সম্মেলন ডেকে প্যান আফ্রিকান আন্দোলনের সূচনা করেন, গড়ে তোলেন Ogranization of African Unity।

বেশ কয়েকটি আফ্রিকান কলোনিতে জাতিদাঙ্গার সমস্যা ছিল। এর কারণ ছিল শ্বেতাঙ্গদের বহু সংখ্যায় বসতি স্থাপন। যেমন ট্যাঙ্গানাইকায়, নাইজিরিয়ায়, উগান্ডায় অথবা কিনিয়ায়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ট্যাঙ্গানাইকা স্বাধীন হয়েছিল। ট্যাঙ্গানাইকায় ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে জুলিয়াস নিয়েরের নেতৃত্বে Tanganyika African National Union নামক রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছিল। এই দলের নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করলে ব্রিটিশরা তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবরে ব্রিটিশরা উগান্ডাকে স্বাধীনতা দেয়। উগান্ডায় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ছিলেন মিলটন ওবোতে (Milton Obote)। তিনি Uganda People's Congress নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। উগান্ডায় জমিদার শ্রেণি স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল কারণ এদের আশঙ্কা ছিল স্বাধীনতার পর উগান্ডায় গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জমিদারদের কোনো ভূমিকা থাকবে না। বিরোধিতা সত্ত্বেও উগান্ডা ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা পায় এবং উগান্ডায় প্রধানমন্ত্রী হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন মিলটন ওবোতে। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার জাঞ্জিবারকে আরবদের হাতে তুলে দিলে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জাঞ্জিবার ট্যাঙ্গানাইকার সঙ্গে যুক্ত হলে এই দুই মিলিত রাষ্ট্রের নাম হয় তাঞ্জানিয়া (Tanzania)।

কেনিয়া ছিল বিভিন্ন জাতি-অধ্যুষিত। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ কিকুই উপজাতি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মাউ-মাউ (Mau Mau) নামে এক গুপ্ত সমিতি গঠন করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। এই সংগঠন ছিল সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী। তাদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনকে ব্রিটিশরা অত্যন্ত নির্মমভাবে দমন করেছিল। কেনিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা জেমো কেনিয়াটা (Jamo Kenyatta) ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। তিনি Kenya African National Union নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করে স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ইতিমধ্যে জেমো কেনিয়াটার নেতৃত্বে বিভিন্ন উপজাতি ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে কেনিয়ার স্বাধীনতা সফল করেন। ঐ একই বছরে স্বাধীন হয় উত্তর রোডেশিয়া, যার নাম হয় জাম্বিয়া। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘ লড়াই-এর পর দক্ষিণ রোডেশিয়া স্বাধীন জিম্বাবোয়ে রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোজাম্বিক এবং পশ্চিম উপকূলে অ্যাঙ্গোলা পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। অ্যাঙ্গোলীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল Popular Movement for the Liberation of Angola নামক রাজনৈতিক সংগঠন। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে অ্যাঙ্গোলা স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে মোজাম্বিক-ও স্বাধীনতা পায়।

মরক্কো ফরাসি ঔপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই-এ অগ্রসর হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের কাছ থেকে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা স্বীকৃতি মরক্কোর জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলে। এ ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে ছিল মরক্কোর রাজনৈতিক দল ইস্তিকলাল (Istiqlal) এবং সুলতান সিদি মুহম্মদ বেন্ ইউসুফ। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ২ মার্চ ফ্রান্স মরক্কোর স্বাধীনতা স্বীকার করে। ঐ একই বছরে স্বাধীন হয় টিউনিসিয়া।

মরক্কো ও টিউনিসিয়া ছিল ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য, কিন্তু আলজিরিয়া ছিল পুরোপুরি ঔপনিবেশ। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সংঘটিত হয় আলজিরিয়ার স্বাধীনতার যুদ্ধ। ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ ছিল আলজিরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম। এর চরিত্রও ছিল জটিল। গেরিলা যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, অত্যাচার এই যুদ্ধের প্রকৃতিকে জটিল করে তুলেছিল। আলজিরিয়ার নবগঠিত National Liberation Front-এর নেতৃত্বে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। একটি সার্বভৌম আলজিরিয়া রাষ্ট্র গঠনের পাশাপাশি এদের লক্ষ্য ছিল এক ইসলামী পরিকাঠামোর মধ্যে সামাজিক গণতন্ত্র এবং আলজিরিয়ার যে কোনো অধিবাসীর জন্য সমনাগরিকত্ব। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ৩ জুলাই আলজিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে এবং দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে বেন বেলা নির্বাচিত হন।

৩.৩.১ দক্ষিণ আফ্রিকা

আফ্রিকার অব-ঔপনিবেশিকতা বহুদিন পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। দীর্ঘকাল দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবিদ্বেষী সরকার মানবতাবাদী বিরোধী কাজ করেছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বাধীন হলেও সেই স্বাধীনতার কোনো অর্থ ছিল না কালো মানুষদের কাছে কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় বাস করা সংখ্যালঘু ইংরেজদের হাতে শাসনভার থেকে গিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকার বর্ণবিদ্বেষকে তাদের শাসনের মূল বিষয়ে পরিণত করেছিল। 'বর্ণবৈষম্যবাদ'-এর অর্থ আফ্রিকায় কালো মানুষদের আলাদাভাবে বাস করতে বলা। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বর্ণবৈষম্য তীব্র রাজনৈতিক চেহারা নিয়েছিল। শিক্ষা, যাতায়াত, বাসস্থান, চাকরি সবক্ষেত্রেই আফ্রিকার কালো মানুষদের পৃথক করে রাখা হত।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে সার্পভিল এবং জোহানেসবার্গের কাছে সোয়েটাতে পুলিশী হাঙ্গামায় অনেক কালো মানুষের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পর থেকে বর্ণবৈষম্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের আসল লড়াই শুরু হয়। আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম শুরু করে। এই আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন নেলসন ম্যান্ডেলা। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে নেলসন ম্যান্ডেলাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়, নিষিদ্ধ করা হয় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস। এরপর প্রায় দু দশক ধরে উত্তেজনার স্থিতাবস্থা ছিল। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারীতে নিঃশর্তে মুক্তি পেয়েছিলেন ম্যান্ডেলা। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে ম্যান্ডেলার দল আফ্রিকার ন্যাশনাল কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছিল এবং তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকা বর্ণবাদী শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি পায়।

৩.৪ উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশগুলিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিকাশ লাভ করে। তবে ঔপনিবেশগুলিতে একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয়নি এবং অব-ঔপনিবেশিকতার পর্যায়কাল ও ধরন ছিল ভিন্ন। এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন পটভূমিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের সূচনা হলেও এশিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল সাধারণত শহরকেন্দ্রিক। আন্দোলন এককভাবে শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয়নি। আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন ধারা ও প্রবণতার মিশ্রণ ছিল।

দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিসমাপ্তিতে আফ্রিকা মহাদেশের বহু দেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মানব মুক্তির ইতিহাসে আফ্রিকা মহাদেশের নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির জন্ম নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ যুগের সৃষ্টি করেছে।

৩.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার অবসান কীভাবে হয়েছিল?

২। দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ায় ঔপনিবেশগুলিতে ক্ষমতা হস্তান্তর কি সুশৃঙ্খলভাবে হয়েছিল?

৩। আফ্রিকায় অব-ঔপনিবেশিকতার পর্যায়কাল ও ধরন ব্যাখ্যা করুন।

৩.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Elite Kedourie—*Nationalism in Asia and Africa,* Routledge, 1974।

২। Peter Calvocoressi—*World Politics since 1945*, Latest Edition, England, 2009।

৩। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক,* কলকাতা, ২০০৬।

৪। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬),* কলকাতা, ২০০৫।

একক-৪ ❑ নয়া-ঔপনিবেশবাদ

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- নব ঔপনিবেশবাদ বলতে কী বোঝায়।
- সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলেও নানা ধরনের কৌশল অবলম্বন করে ঔপনিবেশগুলির উপর তাদের পুরোনো আধিপত্যকে বজায় রাখার জন্য কয়েকটি কৌশল অবলম্বন করেছিল।
- সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করে।
- উন্নত পশ্চিম মহল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অবাধ করে তোলার আহ্বান জানায় এবং তৃতীয় দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রাহ্য করা হয়।
- শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, নয়া ঔপনিবেশবাদের কৌশলগুলি রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে কার্যকর হয়।

- পুঁজিবাদী দেশগুলি সামরিক জোট গঠন করে ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা করে।
- নয়া ঔপনিবেশবাদ তার পূর্বসূরী সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের থেকে অনেক বেশি ব্যাপক।

৪.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকাল ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি বিভিন্ন কারণে তাদের ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলেও ঐ দেশগুলি থেকে ঔপনিবেশবাদের অবসান হয়নি। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি মূলত অর্থনৈতিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য নানা উপায় অনুসন্ধান করতে থাকে।

৪.২ নয়া-ঔপনিবেশবাদ : সংজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি তাদের ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে এশিয়া ও আফ্রিকা অঞ্চলের ঔপনিবেশগুলি একে একে স্বাধীনতা অর্জন করতে থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হলেও ঐ দেশগুলি থেকে ঔপনিবেশবাদের অবসান হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি ঔপনিবেশগুলি হারিয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য নতুন উপায় অনুসন্ধান করতে শুরু করে যার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে পারে। এই নতুন উপায় বা কৌশলকে 'নব ঔপনিবেশবাদ' বলা যায়। ব্রুটেন্ট্সের (Brutents) মতে নয়া ঔপনিবেশবাদ হল তৃতীয় বিশ্বের সফল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে পশ্চাতবাদী সাম্রাজ্যবাদের পাল্টা জবাব। সদ্য-স্বাধীন দেশগুলি নানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল যার সৃষ্টিকর্তা ছিল পুরোনো ঔপনিবেশিক শক্তি। এগুলি মূলত অর্থনৈতিক শৃঙ্খল। ঔপনিবেশবাদের এই নয়া কলেবর হল 'নয়া-ঔপনিবেশবাদ'।

৪.৩ নয়া ঔপনিবেশবাদের কৌশল

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির পুরোনো শোষণ অব্যাহত ছিল। পূর্বে তারা যেভাবে শোষণ করত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অর্থাৎ নয়া ঔপনিবেশবাদ-এর যুগে সেই ধারার পরিবর্তন হয়েছিল। ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা (Nkrumah)-র বক্তব্য হল, বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি কেবল সামরিক পদ্ধতির মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করে না, তারা অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, মতাদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, সামরিক জোট গঠন, সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, অসম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, প্রযুক্তি বিজ্ঞান ইত্যাদি দিক থেকে তাদের পরনির্ভরশীল করে দেওয়া, সন্ত্রাসবাদী ও নাশকতাকে উৎসাহ দেওয়া, কঠোর শর্তে ঋণ দেওয়া ইত্যাদি

নীতি অনুসন্ধান করে তাদের পুরোনো আধিপত্যকে বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল ছিল। দেশগুলিতে ছিল পুঁজির অভাব, বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পশ্চাদপততা, শিল্পের অভাব এবং দারিদ্রতা। এই নতুন রাষ্ট্রগুলি তাদের আর্থিক উন্নতির জন্য ঋণের প্রয়োজনে পুঁজিবাদী দেশগুলির নিকট সাহায্য নিতে বাধ্য হয়। পুঁজিবাদী দেশগুলি এই সব দেশগুলিকে শর্ত সাপেক্ষে ঋণ দেয়। এই শর্তগুলি কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতা দেশের স্বাধীনতাকে হরণ করেনি, রাজনৈতিক পরিসর ও সার্বভৌমত্বকে-ও আচ্ছন্ন করেছে। এইভাবে রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হলেও, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনেকাংশই বৈদেশিক সংগঠন বা বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। একে 'Economic Dependency' বা অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা বলা হয়। সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীনতা পেলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তারা পুঁজিবাদী দেশগুলির কৃপাপ্রার্থী। পুঁজিবাদী দেশগুলি অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে সেই দেশের আর্থিক কাঠামো, পরিকল্পনা, আমদানি ও রপ্তানি শুল্কের হার ইত্যাদি প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে।

৪.৩.১ পুঁজি বিনিয়োগ

নয়া ঔপনিবেশবাদের একটি কৌশল হল সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে অর্ধিক মুনাফার লোভে পুঁজি লগ্নী করা। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব না থাকায় এবং সস্তায় শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হওয়ায় পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশে তাদের লগ্নী করতে আগ্রহী হয়েছিল। উৎপাদিত পণ্যকে তারা বিশ্বের বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির অর্থনীতিকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালনা করে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের শোষণ অব্যাহত রেখেছে। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি বিদেশিদের পুঁজি নিয়ন্ত্রিত শিল্প কলকারখানাগুলিকে জাতীয়করণের চেষ্টা করলে বিদেশি রাষ্ট্রগুলি জাতীয়তাকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে। তারা এত বেশি ক্ষতিপূরণ দাবি করেছে যে উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

৪.৩.২ বাজার অর্থনীতি

নয়া-ঔপনিবেশবাদের আর একটি দিক হল বাজার অর্থনীতি। GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) চুক্তি ও ডাঙ্কেল প্রস্তাব প্রায় সব রাষ্ট্র মেনে নেওয়ায় তৃতীয় বিশ্বে লগ্নীর পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলি উপলব্ধি করে যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি কৃষি ও শিল্পে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠলে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির রপ্তানি বাণিজ্যের হার সংকুচিত হবে। এই পরিস্থিতি প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির মস্তিষ্কপ্রসূত নীতি GATT, WTO, বিশ্বায়ন প্রভৃতি। দ্রুত বিকাশের জন্য তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির প্রয়োজন শিল্পোন্নত রাষ্ট্রগুলির নিকট থেকে অর্থনৈতিক, প্রাযুক্তিক ও অন্যান্য সাহায্য। এই সাহায্যের বিনিময়ে তারা অনুন্নত দেশগুলিকে আপত্তিজনক শর্তাবলী মেনে নিতে বাধ্য করেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকে অবাধ করে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে উন্নত পশ্চিমে মহল থেকে। স্বয়ংনির্ভরতার কথা তুলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আমদানির পরিবর্তে

উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া হয়। রপ্তানি বৃদ্ধির চেষ্টা করেও উন্নয়নশীল দেশগুলি আশানুরূপ বিদেশি মুদ্রা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, কারণ বিদেশের বাজারে তাদের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক দাম সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশগুলির উৎপাদিত পণ্যের মূল্য বেশি থেকে যায়। এই অসম বাণিজ্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল দেশগুলি সরব হলে এবং বিশেষ সুবিধা আদায়ের জন্য চাপ দিলে সাধারণীকৃত একটি পছন্দ ব্যবস্থা (Generalised System of Preference) চালু হয় জাতিপুঞ্জ আয়োজিত দ্বিতীয় বাণিজ্য সম্মেলনে। এর দ্বারা বাছাই করা কয়েকটি পণ্যের ওপর সুবিধাজনক শুল্ক দেওয়া হলেও উন্নয়নশীল দেশগুলির উৎপন্ন পণ্যের অনেকগুলি এর বাইরে থেকে যায়। তৃতীয় দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি অগ্রাহ্য হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলি সব কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয় কারণ অনেক দেশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ায় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের শর্তাবলী মেনে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।

৪.৩.৩ মতাদর্শগত চিন্তাধারা

নয়া-ঔপনিবেশবাদের কৌশলগুলি ব্যাখ্যা করে নক্রুমা (Nkrumah) বলেছেন যে নয়া-ঔপনিবেশবাদের কৌশলগুলি অতি সুক্ষ ও বিচিত্র এবং এগুলি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কার্যকর নয়, রাজনৈতিক, মতাদর্শগত ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। নয়া-ঔপনিবেশবাদ মতাদর্শগতভাবে যথেষ্ট সক্রিয়। গণপ্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমগুলির সাহায্যে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও আদর্শগুলি তৃতীয় বিশ্বের জনগণের কাছে অতি সহজেই প্রচার করে তাদের নিজস্ব ভাবধারাকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রচারের অন্যতম লক্ষ্য হল পশ্চিমি উদারনৈতিক ও গণতান্ত্রিক মতাদর্শের সম্প্রচারের মাধ্যমে সাম্যবাদী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে মনোভাব সৃষ্টি করা যাতে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলি রাষ্ট্রের পরিকাঠামো সৃষ্টির সময় সমাজতান্ত্রিক আদর্শ দ্বারা পরিচালিত না হয়। সোভিয়েত রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্রগুলিতে সাম্যবাদের প্রভাবের ফলে পশ্চিমি শিল্পোন্নত শক্তিগুলি ভয় পায় এবং চেষ্টা করে যাতে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে।

৪.৩.৪ সামরিক জোট গঠন

পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সামরিক জোট গঠন করে ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রচেষ্টা করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির উদ্যোগে ন্যাটো, সিয়াটো, সেন্টো বা বাগদাদ চুক্তি জোট গঠিত হয়। সামরিক ঘাঁটিগুলি ও অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সিয়াটো, সেন্টো প্রভৃতি সামরিক সংগঠনগুলিতে সদ্য স্বাধীন দেশগুলির সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সাথে সহাবস্থান নয়া ঔপনিবেশবাদের একটি উদ্যোগ। এইসব জোটের উদ্দেশ্যে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নসহ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে চাপে রাখা।

৪.৪ নয়া-ঔপনিবেশবাদের প্রভাব

নয়া-ঔপনিবেশবাদ তার পূর্বসূরী সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদের থেকে অনেক বেশি ব্যাপক। বিদেশি পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করেও অনুন্নত দেশগুলি তাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না। উন্নয়নের খাতে ব্যয় করার জন্য শিল্পোন্নত দেশগুলি যে ঋণ দান করছে তার সুদের পরিমাণ অনেক বেশি। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলি বাধ্য হয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে শর্তসাপেক্ষে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণ করছে। সুদের অর্থ মেটাতে তারা সক্ষম না হওয়ায় ঋণের জালে তারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এছাড়া পুঁজিবাদী দেশগুলি কর্তৃক তাদেরকে অর্থের বিনিময়ে যেসব কারিগরি কলাকৌশলের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে সেগুলি অত্যাধুনিক নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্রযুক্তিবিদ্যায় শিক্ষাপ্রাপ্তেরা অত্যাধুনিক কলাকৌশলের ব্যবহারিক তাৎপর্যের সঙ্গে পরিচিত নয়। মেধা চালান (Brain drain) উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আশানুরূপ উন্নয়ন না হওয়ার অপর কারণ। উন্নয়নশীল দেশগুলি তাদের রাজকোষ থেকে অর্থ খরচ করে প্রযুক্তিবিদ তৈরি করলেও তারা তাদের সেই মেধাকে ধরে রাখতে পারছে না। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি প্রচুর অর্থের প্রলোভন দিয়ে সেই মেধাকে কিনে নিচ্ছে এবং নিজেদের গবেষণা সমৃদ্ধ করে তুলেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলির সাবেকি শিল্পগুলিকে ধ্বংস করে নিজেদের স্বার্থে উন্নয়নশীল দেশগুলির বাজার দখল করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি বাধ্য হয়ে পুঁজিবাদী দেশগুলির কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করছে। অর্থ, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো সব কিছুর উপরেই তারা পুঁজিবাদী দেশগুলির প্রতি নির্ভরশীল।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে এই নির্ভরশীলতার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা তখনই সম্ভব যখন তারা একটি স্বাধীন অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এর জন্য প্রয়োজন জাতীয় নেতৃত্বের এমন কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করা, যার দ্বারা জাতীয় সম্পদ ও সংস্থাগুলির জাতীয়করণ, কৃষির আধুনিকীকরণ, সামাজিক বীমাকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির সফলভাবে রূপায়ণ সম্ভব হয়। এর জন্য প্রয়োজনীয় হল জনসচেতনা বৃদ্ধি ও জাতীয় রাজনীতিতে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা পালন।

৪.৫ উপসংহার

সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তাদের ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দিলেও তাদের উপর অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের কৌশল অবলম্বন করে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি শুধুমাত্র সামরিক পদ্ধতির মাধ্যমে নয়, তারা অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ, মতাদর্শগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, সামরিক জোট গঠন, অসম বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন, প্রযুক্তি বিজ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিকে পরনির্ভরশীল করে তাদের পুরোনো আধিপত্যকে বজায় রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে এই নির্ভরশীলতাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রয়োজন জাতীয় নেতৃত্বের কিছু অর্থনৈতিক কর্মসূচির সফল রূপায়ণ।

৪.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। নয়া ঔপনিবেশবাদ-এর সংজ্ঞা দিন।

২। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলিতে তাদের পুরোনো আধিপত্য বজায় রাখার জন্য কী ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিল?

৪.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

২। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)*, কলকাতা, ২০০৭।

৩। মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়—*সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০২০।

পর্যায় ২ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ঘটনাবলী

একক-৫ ❑ যুদ্ধোত্তর বিশ্বে ঠাণ্ডা লড়াই

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- ঠাণ্ডা লড়াই কাকে বলে
- ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব ও চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের ধারণা
- ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা কীভাবে হয়েছিল

৫.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল চালিকাশক্তি হল ঠাণ্ডা যুদ্ধ বা Cold War। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মানীর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত

ইউনিয়নের যে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, যুদ্ধ শেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের পর দুই মহাশক্তির মধ্যে যুদ্ধকালীন প্রীতির বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বে যুদ্ধ পরবর্তীকালে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য যে সব সম্মেলন ডাকা হয়েছিল সেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলির বিরোধ প্রকাশ্যে এসেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে নানা বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের উদ্ভব হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১২ মার্চ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ঐতিহাসিক নীতি ঘোষণার মাধ্যমে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।

৫.২ ঠাণ্ডা লড়াই : সংজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আগেই পশ্চিম দুনিয়ায় শুরু হয় ঠাণ্ডা লড়াই যা ছিল ধনতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দুই শিবিরের মধ্যে ক্ষমতা ও মতাদর্শের নির্মম প্রতিযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত মার্কিন ভাষ্যকার ও চিন্তাবিদ ওয়াল্টার লিপম্যান তাঁর *The Cold War* গ্রন্থে cold war শব্দটি চয়ন করেছিলেন। পরে এই শব্দটি যুদ্ধোত্তর যুগের স্নায়ুযুদ্ধ সম্পর্কে ব্যবহৃত হয়।

বিশ্ব রাজনীতিতে মেরুকরণ, দুই মহাশক্তিধর দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পরমাণু অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, পশ্চিমি পরিমণ্ডলের বাইরে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বিস্তারের উদ্যোগ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, বাণিজ্যিক বাজার দখলের উদ্যোগ—এই সব ঘটনা এক ভিন্ন ধরনের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে। এর সঙ্গে চলতে থাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনা, বিশ্লেষণ, তত্ত্ব উদ্ভাবন ও বিদেশ নীতিতে তার প্রয়োগ।

৫.৩ ঠাণ্ডা যুদ্ধের উদ্ভব : ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা

ঠাণ্ডা যুদ্ধের উদ্ভব এবং এতে দায়িত্ব কার বেশি সে বিষয়ে ইতিহাসবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মহলে পরস্পর-বিরোধী ধ্যান ধারণা লক্ষ্য করা যায়। ঠাণ্ডা লড়াই-এর চরিত্র সম্পর্কে ইতিহাস চর্চাকে তিনটি শ্রেণিতে পঙ্‌ক্তিবদ্ধ করা যেতে পারে। এগুলি হল—(ক) চিরায়ত ভাষ্য (Traditional Interpretation), (খ) সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা (Revisionist Interpretation), (গ) বাস্তববাদী ব্যাখ্যা (Realist Interpretation)। প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে সংঘাতের চরিত্র ছিল মূলত আদর্শগত এবং এর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সাম্যবাদী মতাদর্শ দায়ী। দ্বিতীয় ভাষ্য অনুসারে সংঘাতের মূলে ছিল অর্থনৈতিক প্রভূত্ব কায়েম করার মার্কিন উদ্যোগ। এই ব্যাখ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করা হয়েছে। তৃতীয় ব্যাখ্যা অনুসারে সংঘাতের কারণ ছিল শক্তির রাজনীতি ও বিশেষ প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপনে সোভিয়েত তৎপরতা এবং এর প্রত্যুত্তরে শক্তিসাম্য বজায় রাখতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া ও বেষ্টনী নীতির অবতারণা।

৫.৩.১ চিরায়ত ব্যাখ্যা : আদর্শগত দ্বন্দ্ব (Traditional Interpretation : Ideological Conflict)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনে সোভিয়েত ইউনিয়নের আচার-আচরণ সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। একনায়কতন্ত্রী ও সাম্যবাদী রাষ্ট্ররূপে সোভিয়েত রাশিয়ার সম্প্রসারণশীল দৃষ্টিভঙ্গি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে শঙ্কিত করে। মার্কিন নৌসচিব জেমস ফরেস্টাল ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে লেখেন, সাম্যবাদী সোভিয়েত পররাষ্ট্রনীতি গণতান্ত্রিক দেশগুলির মুক্তপন্থী পররাষ্ট্রনীতির চেয়ে পৃথক ধরনের কারণ একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণে আগ্রহী। Winston Churchill তাঁর *The Second World War* গ্রন্থে সোভিয়েত বিস্তার নীতিকে ঠাণ্ডা লড়াই-এর উন্মেষের জন্য দায়ী করেছেন। তাঁর মতে, সোভিয়েত বিস্তার নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদের প্রসার ও পুঁজিবাদী সমাজের সংকোচন। এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারী স্টালিনের এক ভাষণের উল্লেখ করা হয় যেখানে স্টালিন কমিউনিজম ও পুঁজিবাদের মৌলিক বৈপরীত্য ও সংঘাতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। স্টালিনের ভাষণের বিষয় ছিল যে সাম্যবাদ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ অপরিহার্য। বস্তুতপক্ষে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বরাজনীতিতে যে দ্বিমেরুকরণ শুরু হয় তার চরিত্র হল আদর্শগত সংঘাত। দুটি পরস্পর-বিরোধী জীবনচর্চা একে অন্যের সঙ্গে আপসহীন সংঘাতে লিপ্ত হয়।

৫.৩.২ সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা (Revisionist Interpretation)

ষাটের দশক থেকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরিত্র ও দায়িত্ব নিয়ে সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা প্রচলিত হয়। এ বিষয়ে পথিকৃৎ ছিলেন ওয়াল্টার লিপম্যান। তিনি মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থকে বাধাদান সোভিয়েত রাশিয়াকে অনমনীয় করে তুলেছিল। পরবর্তীকালে লিপম্যান উপস্থাপিত ব্যাখ্যা সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকরা সমর্থন করেন, তবে তাদের ব্যাখ্যায় সংঘাত নিছক রাজনৈতিক ছিল না—এর মূলে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। ডি. এফ. ফ্লেমিং তাঁর *The Cold War and its Origins 1917-1960* গ্রন্থে দেখিয়েছেন আমেরিকা যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে বিশ্বের প্রধানতম শক্তিতে পরিণত হয় এবং সক্রিয় বিশ্বনীতি অনুসরণ করার মতো মানসিক ও সহায় সম্পদ তার ছিল। সংশোধনবাদী ব্যাখ্যার একটি বক্তব্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চলরূপে পূর্ব-ইউরোপকে ছেড়ে দিলে, সোভিয়েত রাশিয়া প্রতি আক্রমণের পথ নিত না। অধ্যাপক David Horowitz তাঁর *From Yalta to Vietnam* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল যুদ্ধের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত। এই অবস্থায় রাশিয়ার পক্ষে সম্প্রসারণের পথ অনুসরণ করা অথবা বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ প্রসারের পরিকল্পনা করা ছিল অকল্পনীয়। স্টালিন একটি আত্মরক্ষামূলক রক্ষণাত্মক নীতির পক্ষপাতী ছিলেন, শুধুমাত্র পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার স্বার্থে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাবাধীন বলয় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। Gabrial Kolko তাঁর *The Politics of War : The World and United States Foreign Policy, 1943-1945* গ্রন্থে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের চরিত্র সম্বন্ধে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের প্রধানতম অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং এই অর্থনৈতিক শক্তিকে নিয়োজিত করে

বিশ্ব অর্থনীতির পরিচালিকা শক্তিতে পরিণত হতে চেয়েছিল। যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতির অর্থনৈতিক লক্ষ্য পূরণের প্রধানতম বাধা ছিল কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ—তাই সাম্যবাদ বিরোধী ধর্মযুদ্ধের মতাদর্শ উপস্থাপিত করা হয়েছিল। কঠোর সংশোধনবাদীরা মনে করেন ঠাণ্ডা লড়াই ততটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল না, যতটা সামগ্রিক জগতে মার্কিন সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ছিল—যে জগৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রণ করেনি ও সৃষ্টিও করেনি।

৫.৩.৩ বাস্তববাদী ব্যাখ্যা (Realist Interpretation)

বাস্তববাদী ঐতিহাসিকরা মনে করেন ঠাণ্ডা লড়াই আগমনে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষই দায়ী ছিল অথবা কেউ দায়ী ছিল না। দুই পক্ষই সীমিত উদ্দেশ্য নিয়ে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিল। কিন্তু বারংবার সংঘাতের ক্ষেত্র প্রসারিত হয় এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধ এক সার্বিক চরিত্র ধারণ করে। বাস্তববাদী ব্যাখ্যার দুই প্রবক্তা হ্যানস্ জে. মরগ্যানথো ও লুই জে. হ্যালে মরগ্যানথো *In Defence of the National Interest : A Critical Examination of American Foreign Policy* গ্রন্থে বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ধারাবাহিক সুনির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ করেনি এবং সোভিয়েত সম্প্রসারণ নীতিকে সাম্যবাদী মতাদর্শের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দেয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবী জগতের কর্ণধাররূপে চিহ্নিত করেছিল।

সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ ঠাণ্ডা যুদ্ধকে নিছক আদর্শগত সংঘাত মনে করেন না, আবার ঠাণ্ডা লড়াইকে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অনুঘটক বলে না মনে করে আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব ও শান্তি সংরক্ষক বলে অভিহিত করেছেন। মার্কিন লেখক জন গ্যাডিস *The Long Peace : Inquiries into the History of the Cold War* গ্রন্থে ঠাণ্ডা যুদ্ধকে যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিরূপে বিচার না করে দীর্ঘসূত্রী শান্তির পরিচায়করূপে চিহ্নিত করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে জটিলতা ও উত্তেজনা সৃষ্টি করলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী ব্যবস্থা একটি—'আত্মনিয়ন্ত্রণকারী' ব্যবস্থার রূপ নিয়েছে এবং চার দশককাল ধরে পৃথিবী বড় মাপের সংঘাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে। এই অর্থে অধ্যাপক গ্যাডিস ঠাণ্ডযুদ্ধের যুগকে দীর্ঘ শান্তির যুগ বলতে চেয়েছেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির কাঠামো দ্বিমেরুকরণের ফলে দুই মহাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই প্রচলিত কাঠামোর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিল। গ্যাডিস মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা সোভিয়েত ইউনিয়ন কেউই অন্যকে ধ্বংস করতে চায়নি। মার্কিন বেষ্টনী নীতি সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করতে চায় নি, সংযত করতে চেয়েছিল এবং সোভিয়েত মানসিকতার পরিবর্তন চেয়েছিল। অন্যদিকে স্টালিন দুই পরস্পর-বিরোধী শিবিরের মধ্যে অনিবার্য সংঘর্ষের কথা বললেও রাশিয়ার নিরাপত্তা রক্ষাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। স্টালিন পরবর্তীকালে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বস্তুত দুই মহাশক্তির কেউই নিজ নিজ দেশের স্বার্থের চেয়ে আদর্শগত সংঘাতকে অগ্রাধিকার দিতে চায় নি।

৫.৪ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা

ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ নিয়ে মিত্র শক্তিগুলির মধ্যে কূটনৈতিক আলাপ আলোচনায়। ঐতিহাসিকদের মতে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ ছিল বৃহৎ বিভাজিকা

যখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সম্ভাব্য পদ্ধতির নির্ধারকরূপে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়। পূর্ব ইউরোপ সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্নমুখী লক্ষ্যসমূহের বিষয়টি এই সময়ই সরাসরিভাবে প্রকাশ্যে আসে। মিত্র শক্তির তিন যুদ্ধকালীন নেতৃবর্গ রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্টালিন যখন ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারীতে ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হন তখন ইউরোপ বিভাজন একটি বাস্তব ঘটনা। পূর্ব ও মধ্য ইউরোপ সোভিয়েত অথবা কমিউনিস্ট আধিপত্যাধীন হয়। ইয়াল্টা সম্মেলনে পোলিশ প্রশ্নটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন মূলত তার নিরাপত্তার স্বার্থে পোল্যান্ডে একটি সোভিয়েত ঘেঁষা সরকার চাইলে অন্য দুটি শক্তি সেখানে কমিউনিস্ট বিরোধী পাশ্চাত্য ঘেঁষা সরকার চায়। Keneth W. Thomson মন্তব্য করেছেন কেবলমাত্র পোলিশ প্রশ্নটিকে নিয়ে না হলেও ইয়াল্টা সম্মেলন যুদ্ধকালীন সহযোগিতার যুগ এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের মধে জলবিভাজিকার ন্যায় ছিল।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১২ই মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানের ঐতিহাসিক নীতি ঘোষণার মাধ্যমে ঠাণ্ডা লড়াই-এর আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে, মার্কিন পররাষ্ট্রনীতর চরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়। এই সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কঠোর সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। তাঁর অভিমত ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন যৌথভাবে রাশিয়াকে ইয়াল্টা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য চাপ সৃষ্টি করবে অর্থাৎ পূর্ব ইউরোপে স্বাধীন অবাধ নির্বাচন ও পূর্ব জার্মানী থেকে রুশ সেনা অপসারণ করতে বাধ্য করা হবে। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে এসে, মিসৌরি প্রদেশের ফালটনে ওয়েস্টমিনস্টার কলেজে সম্মানসূচক ডিগ্রি গ্রহণ কালে ভাষণদান করেন তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসী দূরভিসন্ধিমূলক তৎপরতা সম্পর্কে সাবধান করেন এবং এই পরিস্থিতিতে যৌথ ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তাঁর মতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে এই বাস্তব সত্যটি মেনে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এগোতে হবে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ১২ মার্চ রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান মার্কিন কংগ্রেসে প্রদত্ত ভাষণে গ্রীস ও তুরস্কে মার্কিন সহায়তাদানের জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই সময় তাঁর বিবৃতিতে ব্যাপকভাবে মানসিক ও আদর্শগত যুক্তি প্রকাশ পায়। তাঁর মতে সমগ্র বিশ্ব এখন দুটি পরস্পর-বিরোধী জীবনচর্চা দ্বারা পরিচালিত। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম দায়িত্ব হল মুক্ত জাতিগুলির সার্বিক অখণ্ডতা ও মুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখা। তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবশ্যপালনীয় নীতি হল যে সমস্ত মুক্ত জাতি সশস্ত্র সংখ্যালঘুদের আক্রমণ অথবা বিদেশি চাপের প্রতিরোধে নিয়োজিত তাদের যথাযথ সমর্থন জানানো। ট্রুম্যানের এই ঘোষণা ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) নামে পরিচিত। ট্রুম্যান নীতি ঘোষণার ফলে এক বিশ্বজনীন সক্রিয় হস্তক্ষেপমুখী পররাষ্ট্র নীতির অবতারণা হয়। বিশ্ব রাজনীতিতে এক সংঘাতপূর্ণ মাত্রা সংযোজিত হয়। উষ্ণ যুদ্ধের অবসানের পর বিশ্ব রাজনীতি ঠাণ্ডা যুদ্ধের খাতে প্রবাহিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন এই মার্কিন পদক্ষেপের মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স ও ইটালিসহ পূর্ব ইউরোপের সকল কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে নিয়ে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কমিনফর্ম বা কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো (Cominform or Communist Information Bureau) গঠন করে। কমিনফর্ম গঠনের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিকল্পনাকে সহায়তা করা।

অপরদিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ মনে করে যে সোভিয়েত রাশিয়ার এই পদক্ষেপ বিশ্ববিপ্লবের জন্য সোভিয়েত লক্ষ্যের নির্দেশক। এর পাল্টা প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইউরোপে সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদ-এর গতিরোধ করার জন্য নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অরগেনাইজেশন বা ন্যাটো (North Atlantic Treaty Organisation or NATO) গঠন করে।

৫.৫ উপসংহার

ঠাণ্ডা লড়াই ছিল পশ্চিমি দুনিয়ায় ধনতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী দুই শিবিরের মধ্যে ক্ষমতা ও মতাদর্শের নির্মম প্রতিযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। ঠাণ্ডা যুদ্ধের উদ্ভব ও দায়বদ্ধতা নিয়ে ইতিহাসবিদ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মহলে পরস্পর-বিরোধী ধ্যান ধারণা লক্ষ্য করা যায়। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকগণ ঠাণ্ডা যুদ্ধকে নিছক আদর্শগত সংঘাত মনে করেন না, আবার ঠাণ্ডা লড়াইকে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অনুঘটক বলে মনে না করে আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব ও শান্তি সংরক্ষক বলে অভিহিত করেছেন।

৫.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। ঠাডা লড়াই বলতে কী বোঝায়?

২। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের উদ্ভব সম্পর্কে ইতিহাসচর্চা বিষয়ে আলোচনা করুন।

৩। কীভাবে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূচনা হয়েছিল?

৫.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। Lovis J. Halle—*Cold War As History*, New york, 1967।

২। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

৩। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—*আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০১১।

একক-৬ ❑ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন ও কার্যাবলী

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয়েছিল
- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য কী ছিল
- এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের নীতি কী ছিল

- জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল পাঁচটি অঙ্গ নিয়ে, এই এককে এই সংস্থাগুলির গঠন ও কার্যাবলী আলোচিত হবে।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই একই উদ্দেশ্যে গঠিত হয় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ। এই দুই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য এই এককে আলোচিত হবে।

৬.১ ভূমিকা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীকে যুদ্ধ মুক্ত করার এবং শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার তাগিদে জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু জাতিসংঘ তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় বিশ্ব আবার এক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধ শেষে সকল রাষ্ট্রের ঐক্যমতের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার তাগিদে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ অক্টোবর নিউ-ইর্য়কে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রকৃত অর্থে একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন। আন্তর্জাতিক শান্তি নিরাপত্তা বজায় রাখা, পরিবেশ সংরক্ষণে এবং মানবাধিকার রক্ষায় জাতিপুঞ্জ প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে।

৬.২ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা : প্রেক্ষাপট

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও ধ্বংসলীলার অবসানের পর দু'দশক অতিক্রান্ত হবার আগেই পৃথিবীতে আরও ভয়াবহ ও বীভৎস 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' শুরু হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। যুদ্ধের হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার জন্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কিন্তু নানা কারণে জাতিসংঘ তার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বিশ্ব আবার মহাযুদ্ধের সম্মুখীন হয় এবং এই যুদ্ধে পৃথিবী জুড়ে ধ্বংসলীলা, হত্যা, আতঙ্ক, অস্থিরতা, সম্পদের বিনাশ শান্তিকামী মানুষকে বিশ্ব শান্তির জন্য ব্যাকুল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় বহু রাষ্ট্রনায়ক ভবিষ্যৎ যুদ্ধকে বন্ধ করার জন্য নানা উদ্যোগ গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক হিসাবে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে প্রকাশিত হয় 'লন্ডন ঘোষণা'। লন্ডন ঘোষণায় স্বাক্ষর করে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউনিয়ন অব সাউথ আফ্রিকা ও ব্রিটেন। লন্ডন ঘোষণায় স্থায়ী শান্তির উপর ও সকল মানুষের আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তাযুক্ত আগ্রাসনমুক্ত পৃথিবী গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। একই বছরে ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল আটলান্টিক মহাসাগরে মিলিত হয়ে 'আটলান্টিক সনদ' ঘোষণা করেন। আটটি মৌলিক নীতি বিশিষ্ট এই আটলান্টিক সনদকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রস্তুতির ভিত্তি বলা যাবে কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও একথা বলতে দ্বিধা নেই যে দুই রাষ্ট্রনেতা বিশ্বের শান্তি ও নিরাপত্তা নিয়ে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন।

১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিন ও সোভিয়েত রাশিয়া ওয়াশিংটন শহরে সম্মেলনে মিলিত হয়ে 'জাতিপুঞ্জের ঘোষণা' বা 'ইউনাইটেড নেশনস্ ডিক্লারেশন' নামে এক দলিলে স্বাক্ষর করেন। এই ঘোষণা দ্বারা আটলান্টিক চার্টারের নীতি সমূহকে সমর্থন জানানো হয়। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল পৃথিবীর সব জাতি যাতে শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রবর্গ অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে তাদের সকল সম্পদ ও সামরিক শক্তি প্রয়োগ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। স্থির হয় যে, মিত্রশক্তির অন্তর্গত কোনো রাষ্ট্র পৃথকভাবে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করবে না। বলা হয় এই সংগ্রামে সাহায্য করতে ইচ্ছুক যে কোনো রাষ্ট্র ওয়াশিংটন ঘোষণায় সামিল হতে পারবে। এই সময় থেকেই যুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ শুরু হয়।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে ওয়াশিংটনের 'ডাম্বারটন ওক্স' নামে প্রাসাদে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চিনের প্রতিনিধিবৃন্দ এক সম্মেলনে মিলিত হন। এই সম্মেলনে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন সম্পর্কিত প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত সংস্থার নাম দেওয়া হয় 'ইউনাইটেট নেশনস' বা রাষ্ট্র সংঘ। এই সম্মেলনে স্থির হয়, প্রস্তাবিত সংস্থার ৪টি বিভাগ থাকবে। এগুলি হল সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক -বিচারালয় ও আর্থ-সামাজিক পরিষদ। শক্তিবর্গের মধ্যে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য দেখা দেয়। ডাম্বারটন ওক্স-এর অসমাপ্ত আলোচনা ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়াল্টা সম্মেলনে সমাপ্ত হয়।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে সানফ্রানসিস্কো শহরে আহুত এক সম্মেলনে একান্নটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি মিলিত হয়ে ডাম্বারটন ওক্স ও ইয়াল্টা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন দেশের মতামত বিচার-বিবেচনা করা হয়। সকল রাষ্ট্রের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রণীত হয় জাতিপুঞ্জের সনদ। নিরাপত্তা পরিষদ স্থায়ী সদস্য হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চিন ভেটো ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ২৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে নিউ ইর্য়কে রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৬.৩ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতিসমূহ

৬.৩.১ উদ্দেশ্য

জাতিপুঞ্জের সনদের ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায়ের দুটি অনুচ্ছেদে এই আন্তর্জাতিক সংগঠনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল :

১। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করা। রাষ্ট্রসংঘ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধের মীমাংসা করবে। আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আন্তর্জাতিক আইন ও ন্যায় নীতি অনুসরণ করা হবে।

২। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মিত্রতা পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। এই মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তি হবে সমানাধিকারের নীতি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ।

৩। রাষ্ট্রসমূহের সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক

সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা এবং মানবিক অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করার জন্য সংগঠন কাজ করবে।

৪। এই সব লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন দেশের কার্যকলাপের মধ্যে সংহতি সাধনের কেন্দ্র হিসাবে রাষ্ট্রসংঘ নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাজকর্মের মধ্যে সংহতি স্থাপন করা ছিল রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য।

৬.৩.২ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি

১। এই সংগঠন সদস্য রাষ্ট্রবর্গের সার্বভৌম সাম্যের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

২। প্রতিটি রাষ্ট্র সনদ অনুযায়ী তাদের দায়িত্বগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করে চলবে যাতে সকলে সব অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে পারে।

৩। সদস্য রাষ্ট্রগুলি শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করবে।

৪। সদস্য রাষ্ট্রবর্গ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অবিচল থাকবে। কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা ভৌগোলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কোনো সদস্য রাষ্ট্র বলপ্রয়োগ করবে না বা বলপ্রয়োগ করার হুমকি প্রদর্শন করবে না।

৫। রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রবর্গ পূর্ণ সহযোগিতা করবে। জাতিপুঞ্জ যদি কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তবে সদস্য রাষ্ট্রগুলি ঐ রাষ্ট্রের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকবে।

৬। বিশ্বশান্তির স্বার্থে রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয় এমন রাষ্ট্রগুলিও যাতে এই সংগঠনের নীতি অনুসরণ করে, তার জন্য প্রয়াস চালানো হবে।

৭। রাষ্ট্রসংঘ কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। তবে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা আন্তর্জাতিক শান্তির পরিপন্থী হলে রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করবে।

৬.৪ জাতিপুঞ্জের গঠন-কাঠামো

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিল পাঁচটি অঙ্গ নিয়ে। এগুলি হল সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিষদ, সচিবালয় এবং অছি পরিষদ। এছাড়া রয়েছে বিশ্ব আদালত, যা জাতিপুঞ্জের অংশ বলেই পরিগণিত। প্রত্যেকটি সংস্থার অধীনে রয়েছে অনেক উপ-সংস্থা, সমিতি, পর্যবেক্ষকদল প্রভৃতি।

৬.৪.১ সাধারণ সভা

সংগঠনের সব সদস্যদের সম্মান মর্যাদায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ রয়েছে এই সংস্থাতে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণই সাধারণ সভার প্রধান কাজ। যে কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় পৃথিবীর পক্ষে সমস্যার কারণ হয়ে থাকলে সে বিষয়ে আলোচনার অধিকার আছে এই সভার। উল্লেখ্য, জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে যতগুলি শান্তি সংস্থাপন প্রয়াস গৃহীত হয়েছে, তার অধিকাংশই কার্যকরী হয়েছে

সাধারণ সভার নির্দেশে। নিরাপত্তা পরিষদের সঙ্গে একযোগে নতুন সদস্যদের অন্তর্ভুক্তি, মহাসচিব এবং বিশ্ব আদালতের বিচারপতিদের নিয়োগ করে এই সভা। এই সভা থেকে নির্বাচিত হয় নিরাপত্তার পরিষদের অস্থায়ী ১০ জন সদস্য, অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিষদের সদস্যগণ এবং অছি পরিষদ থাকাকালীন তার প্রশাসনিক দায়িত্বযুক্ত সদস্যগণ। জাতিপুঞ্জের মহাসচিব নিয়োগেও সাধারণ সভা অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের বার্ষিক বাজেট অনুমোদন, ব্যয়নির্বাহের ওপর নজরদারি এবং সদস্যদের দেয় চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতি সাধারণ সভার একান্ত নিজস্ব ক্ষমতা। সাধারণ সভার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র সম্বরণ নীতির রূপায়ণ। অন্যান্য কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আন্তঃরাষ্ট্র সহযোগিতা বৃদ্ধি, মানবিক অধিকার সংরক্ষণে পদক্ষেপ গ্রহণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আদান প্রদানে উৎসাহ প্রদান।

৬.৪.২ নিরাপত্তা পরিষদ

জাতিপুঞ্জের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন অঙ্গ নিরাপত্তা পরিষদ। এই পরিষদের উপর শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। পাঁচজন স্থায়ী সদস্য এবং ছয় জন অস্থায়ী সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে অস্থায়ী সদস্য দশ জন হয়েছে। পাঁচ জন স্থায়ী সদস্য হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, চিন, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। অস্থায়ী সদস্যরা দুই বছরের জন্য সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। পদ্ধতিগত প্রশ্ন ছাড়া কোনো বিষয়ে যদি কোনো স্থায়ী সদস্য নেতিবাচক ভোট দেন তাহলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। এটি স্থায়ী সদস্যদের 'ভিটো' ক্ষমতা নামে পরিচিত।

বিশ্বের নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষার যে দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল নিরাপত্তা পরিষদ সেই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হয়নি। এর আসল কারণ এই পরিষদে স্থায়ী সদস্যদের অসমর্থনযোগ্য আচরণ এবং সামগ্রিকভাবে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার কাছে এই পরিষদের দায়বদ্ধতার অভাব। ঠাণ্ডা যুদ্ধ চলাকালীন রুশ-মার্কিন বিরোধের কারণে নিরাপত্তা পরিষদ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেনি। NATO এবং WARSAW Pact প্রভৃতি গঠনের ফলে বড় শক্তিগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ অপেক্ষা এই সকল আঞ্চলিক জোটের উপর নিরাপত্তার জন্য বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের ব্যর্থতা থাকলেও সামগ্রিক বিচারে একথা বলা যায় যে এই পরিষদ বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানুষের আশা ভরসার স্থল। কঙ্গো সংকটে এই পরিষদ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে।

৬.৪.৩ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ

জাতিপুঞ্জের কর্ণধারগণ শান্তি ও নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরে সহযোগিতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তরে সহযোগিতা বৃদ্ধি পেলে সংকট হ্রাস পাবে এই ধারণা থেকেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ বা Economic and Social Council গঠিত হয়। প্রথমে ১৮ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হলেও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে সদস্যসংখ্যা ২৭ ও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তা ৫৪-তে পৌঁছায়।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ মানবাধিকার রক্ষা এবং মানব সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক

উন্নতির কাজে নিয়োজিত। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচি গ্রহণ এবং আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য এই পরিষদ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মানবাধিকার বা Human Rights-এর রক্ষা, নারীকল্যাণমূলক কর্মসূচি এই পরিষদ গ্রহণ করেছে। ক্ষতিকারক নেশার বস্তু ব্যবহার ও বিক্রি নিয়ন্ত্রণ, আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ছিন্নমূল উদ্‌বাস্তুদের সাহায্য প্রদান কর্মসূচি এই পরিষদের অন্যতম ইতিবাচক কাজ। এছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মহিলাদের ক্ষমতায়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকার, বিপন্ন দেশগুলিতে আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুবিধ সাফল্য অর্জন করেছে। পরিষদের সঙ্গে যুক্ত বিশেষ সংস্থাগুলি হল আন্তর্জাতিক জরুরি শিশু-তহবিল, ঔষধপত্র তত্ত্বাবধান সংস্থা ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে কতকগুলি বিশেষজ্ঞ কমিটি যেমন আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার প্রভৃতি। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি, শিক্ষার উন্নতি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৬.৪.৪ অছি পরিষদ

বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঔপনিবেশবাদের অবসান জরুরি ছিল। বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরে এমন কিছু অঞ্চল ছিল যারা স্বাধিকার বা স্বশাসন দাবি করার অধিকারী। কিন্তু স্বনির্ভর ও স্বশাসিত অঞ্চল হিসাবে এগিয়ে চলার মতো যথেষ্ট প্রস্তুতি তখনও হয়নি। এই অবস্থায় জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে অছি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। অছি ব্যবস্থা হল পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যবর্তী এক পর্যায়।

অছি পরিষদের কাজ ছিল এশিয়া, আফ্রিকা ও অন্যত্র কয়েকটি ঔপনিবেশের মানুষের স্বাধীনতার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে অছি পরিষদের হাতে ছিল ১১টি দেশের দায়িত্ব, ক্রমশ এই দেশগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সকল দেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল এবং কয়েকটি দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশ দ্রুত গতিতে হয়েছিল।

৬.৪.৫ আন্তর্জাতিক বিচারালয়

আন্তর্জাতিক ন্যায়নীতির সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিবাদ-এর মীমাংসা করা ছিল আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের প্রধান কাজ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা ও মতপার্থক্য দূর করার ক্ষেত্রে এই আদালতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। জাতিপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্রবর্গ আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য। নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে এই বিচারালয়ের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

৬.৪.৬ সদর দপ্তর বা সচিবালয়

জাতিপুঞ্জের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি সদর দপ্তর গঠন করা হয়। এই দপ্তর জাতিপুঞ্জের যাবতীয় রিপোর্ট রচনা, নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভার অধিবেশন-এর ব্যবস্থা করে। এই সচিবালয়ের সর্বোচ্চে থাকেন একজন মহাসচিব। তাঁর ক্ষমতা ও দায়িত্ব অসীম। তিনি রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রশাসনিক কর্তা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক নগরের ইস্ট নদীর তীরে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দপ্তর অবস্থিত।

৬.৪.৭ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা

এই সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কর্মসূচি, শিক্ষার উন্নতি ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউরোপে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, জাদুঘর ইত্যাদির পুনর্গঠনে গুরুত্ব দেওয়া ছাড়া সংস্থার পক্ষ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, অবৈতনিক শিক্ষা ও অনুন্নয়নের প্রতিকার সংক্রান্ত কর্মসূচির রূপায়ণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

৬.৫ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও জাতিসংঘ : সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ হত্যালীলা ও ধ্বংস মানুষের মনে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যে গভীর আকুলতা জন্ম দেয়, তার পরিণতিতে জন্ম নেয় জাতিসংঘ (League of Nations)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাতিসংঘ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অপর একটি সমধর্মী প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (United Nations Organization) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গঠন ও কর্মধারার মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

৬.৫.১ সাদৃশ্য

জাতিসংঘের সাংগঠনিক ও দার্শনিক ভিত্তির উপরই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠন, কর্মধারা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জাতিপুঞ্জ পূর্বসূরীর নিকট অনেকাংশে ঋণী। এই রকম পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্ভব হয়েছে। উভয়েই বিশ্বকে যুদ্ধমুক্ত রাখার ও পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো বিরোধের মীমাংসা করাকে প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে। উভয় সংস্থারই প্রধান অঙ্গগুলির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। জাতিসংঘের সভা, পরিষদ, আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারের স্থায়ী আদালত ও সচিবালয়ের অনুকরণে যথাক্রমে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ও সচিবালয় গঠিত হয়েছে। দুটি সংগঠনেই শক্তিধর রাষ্ট্রগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত।

৬.৫.২ বৈসাদৃশ্য

জাতি সংঘের অভিজ্ঞতার আলোকে অতীতের ভ্রান্তি সংশোধন করে জাতিপুঞ্জকে অধিকতর সক্ষম, সুদৃঢ় ও সচল প্রতিষ্ঠান পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১। জাতিসংঘের পরিষদে যে কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত হওয়া আবশ্যক ছিল। ফলে অনেক ক্ষেত্রে জাতিসংঘের পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বা অকারণে বিলম্ব করেছে। কিন্তু জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নেওয়ার ফলে জটিলতা দূর হয়েছে যদিও স্থায়ী সদস্যদের 'ভেটো' ক্ষমতা এক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা এনেছে।

২। জাতিসংঘের সিদ্ধান্ত মান্য করার ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সকল রাষ্ট্রের পক্ষে ছিল বাধ্যতামূলক।

৩। সকল বৃহৎ শক্তিগুলি একসঙ্গে লিগ বা জাতিসংঘের সদস্যপদ নেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই লিগ বর্জন করে, জার্মানি ও রাশিয়া প্রথমে সদস্যপদ পায়নি। এই বিচারে জাতিসংঘ ছিল প্রথম থেকেই দুর্বল। অন্যদিকে পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর এই দুই বৃহৎ শক্তি প্রথম থেকেই জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ গ্রহণ করায় এর মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়।

৪। জাতিসংঘ ছিল প্রধানত একটি রাজনীতি নিয়ন্ত্রক সংস্থা। পৃথিবীকে যুদ্ধ মুক্ত রাখা এবং ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা ছিল তার লক্ষ্য। কিন্তু জাতিপুঞ্জ বিশ্বের মানবজাতির ঐক্য, সৌহার্দ্য এবং কল্যাণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে জাতিপুঞ্জ একাধিক সংস্থার সৃষ্টি করেছে।

লিগ অব নেশনস্ আন্তর্জাতিক সংগঠন হলেও এর কর্মক্ষেত্র মূলত ইউরোপ ও আতলান্তিক সংলগ্ন এলাকায় আবদ্ধ ছিল। তুলনায়, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রকৃত অর্থে একটি বিশ্বব্যাপী সংগঠন। পৃথিবীর প্রতিটি স্বাধীন দেশ-এর সদস্য। পৃথিবীর নানা প্রান্তে কোনো না কোনো সমস্যা, শান্তি নিরাপত্তা অথবা যে-কোনো প্রয়োজনে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সাড়া দেয়। সর্বোপরি, ঔপনিবেশগুলির বৈদেশিক শাসন মুক্তিতে জাতিপুঞ্জ যে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছে, আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণে যে সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, মানবাধিকার রক্ষায় যে পরিমাণ সাফল্য অর্জন করেছে তা থেকে লিগ আমলের থেকে জাতিপুঞ্জের অগ্রগতি স্পষ্ট হয়েছে।

৬.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

২। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি সমূহ আলোচনা করুন।

৩। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের গঠন-কাঠামো উল্লেখ করে এই সংগঠনের অঙ্গগুলির কার্যাবলী আলোচনা করুন।

৪। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং জাতিসংঘের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কী ছিল।

৬.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। Radharaman Chakraborty—*The UNO-A Study in Essentials*, Calcutta, 1998।

২। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

৩। মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়—*সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০২০।

একক-৭ ❑ তৃতীয় বিশ্ব ও জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- তৃতীয় বিশ্ব বলতে কী বোঝায়।
- তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য কী ছিল।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কীভাবে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিল।
- জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়।
- জোট-নিরপেক্ষতা ধারণার উদ্ভব কীভাবে হয়েছিল।
- জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষাপট তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির অবদান কী ছিল।

- জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিস্তার কীভাবে হয়েছিল।
- জোট-নিরপেক্ষতার ধারণার প্রয়োজনীয়তা আছে কি না।

৭.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক অবসানের সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে এক নতুন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। তৃতীয় বিশ্ব কথাটির নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দ্বিমেরুতাকে অতিক্রম করা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতা থেকে উন্নয়নের অঙ্গীকার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্রমশ নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্ব রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক দেশগুলির শিবির এবং সোভিয়েত রাশিয়ায় অধীনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শিবির এ দ্বিমেরুকরণ হয়। অপরদিকে তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি কোনো শিবিরে যোগ না দিয়ে এক স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। এই নীতিকে অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেড সম্মেলনের পর থেকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর শীর্ষ সম্মেলন এই আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলে। নির্জোট দেশগুলি উন্নয়নকামী মানুষের আবাসভূমি। এই আন্দোলন শোষণকারী প্রভূত্বকামী গোষ্ঠীর থেকে পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে যে সংকট দেখা দিয়েছে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনকে আরও বেশি শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

৭.২ তৃতীয় বিশ্ব : সংজ্ঞা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সূত্র ধরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'তৃতীয় বিশ্ব' নামে এক নতুন ধারণার উদ্ভব হয়েছে। সংবাদপত্র, এবং সাময়িক পত্রে তৃতীয় বিশ্ব কথাটির ব্যবহার হলেও 'তৃতীয় বিশ্ব' নিয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা বা সংজ্ঞা নেই। নানাভাবে এই ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আফ্রিকা মহাদেশের আলজেরিয়ার লেখক ফ্রানজ ফ্যানন্ Frantz Fanon) মনে করেন সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী দুনিয়ার মধ্যে অবস্থিত এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলি নিয়ে-ই 'তৃতীয় বিশ্ব' গঠিত।

আরভিং হেরোউইটজ তাঁর *Three Worlds of Development* গ্রন্থে আর্থিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে তৃতীয় বিশ্বের ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলি যেমন পশ্চিম ইউরোপের দেশসমূহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং এশিয়ার জাপান হল প্রথম বিশ্বের দেশ। সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলিকে বলেছেন দ্বিতীয় বিশ্ব। ঔপনিবেশ শাসনমুক্ত উন্নয়নমুখী দেশগুলিকে তিনি তৃতীয় বিশ্ব বলেছেন। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় অবস্থিত এই দেশগুলি মার্কিন জোট

বা সোভিয়েত জোটে যোগ না দিয়ে বরং উভয় জোটের কাছ থেকে আর্থিক সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করে নিজেদের বিকাশের পথ নিজেরাই নির্ধারণ করছে।

চিনের কমিউনিস্ট নেতা মাও-সে-তুং-এর মতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী। তাদের লক্ষ্য বিশ্বের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করা। এরা হল প্রথম বিশ্ব এবং গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি দ্বিতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। তিনি মনে করেন শোষিত জাতিগুলিই হল তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। চিনসহ সকল সমাজতান্ত্রিক দেশ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার নির্যাতিত জাতিগুলি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বে গঠিত।

অনেকের মতে, যে সব দেশ কেবলমাত্র কৃষিজাত দ্রব্য ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন করে এবং সেগুলিকে শিল্পোন্নত দেশে রপ্তানি করে থাকে, সেই দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত। এই সব দেশগুলি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির ঔপনিবেশ ছিল। তারা স্বাধীন হয়ে কোনো জোটে যোগ দেয়নি। সাধারণভাবে পৃথিবীর অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে তৃতীয় বিশ্ব বলে অনেকে অভিমত পোষণ করেন। ইউরোপের প্রায় সকল দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার জাপান প্রভৃতি শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, শিল্প বাণিজ্যের প্রসারে, উন্নত জীবনচর্চায়, উৎপাদন প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের প্রয়োগে সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক বিকাশের দিক দিয়ে অনেক উন্নত। এদের তুলনায় এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ পিছিয়ে আছে। এই পিছিয়ে পড়া দেশগুলি হল তৃতীয় বিশ্ব।

অনেকে তৃতীয় বিশ্বকে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সমর্থক মনে করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মার্কিনদের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবির বা সোভিয়েত রাশিয়ার নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক শিবিরে যোগ না দিয়ে জোট-নিরপেক্ষ থেকে নিজেদের উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশই জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের শরিক। তবে তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত অনেক দেশ যেমন পাকিস্তান, ইরাক, ইরান জর্ডন পুঁজিবাদী আমেরিকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সেন্টো সামরিক জোটের সদস্য। আবার তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত নয় এমন কয়েকটি দেশ যেমন— ফিনল্যান্ড, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নির্জোট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

৭.৩ তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্য

দ্বিমেরুতাকে অতিক্রম করা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনগ্রসরতা থেকে উন্নয়নের অঙ্গীকার এবং আন্তর্জাতিক স্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ এই তিনটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য তৃতীয় বিশ্বের সব দেশেই লক্ষ্য করা গেছে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুই মহাশক্তির থেকে সমদূরত্ব বজায় রাখা, পুঁজিবাদ ও সোভিয়েত অনুকরণে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কোনো একটিকে অনুসরণ না করে দেশীয় অবস্থার অনুকূল মিশ্র অর্থনীতির অনুসরণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে সাম্রাজ্যবাদী নয়া ঔপনিবেশবাদী কার্যকলাপের প্রতিরোধ।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে কিছু সাধারণ স্বার্থ রয়েছে আবার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। মতাদর্শগত দিক থেকে সব দেশ যে গণতন্ত্র গ্রহণ করেছে, কিংবা দুই শিবিরের প্রতিটি কার্যকলাপ সমান দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করেছে তা নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশ যেমন তাইওয়ান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ব্রাজিল ইত্যাদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বাজারি অর্থনীতি চালু রেখে ও পশ্চিমি পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে জাতীয় আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। অঞ্চলভেদে রাজনৈতিক কৃষ্টি গড়ে উঠেছে এক একরকম আদলে। কমিউনিস্ট শাসন অব্যাহত রেখেও গণপ্রজাতন্ত্রী চিনের নেতৃত্ব নিজেদের তৃতীয় বিশ্বের পর্যায়ভুক্ত বলে দাবি করে এসেছে। অথচ পঞ্চাশের দশকে তার সাম্রাজবাদ বিরোধিতা, ষাটের দশকে তার সোভিয়েত বিরোধিতা এবং সত্তরের দশকে তার পশ্চিমি বাণিজ্য-বলয়ে প্রবেশ এই দাবির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বির্তকিত।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে কয়েকটি সমস্যা বিব্রত করেছে। তৃতীয় বিশ্বের মাঝারি ও ক্ষুদ্র আয়তনের দেশগুলির অধিকাংশ সামরিক দিক থেকে দুর্বল হওয়ায় এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণে একার শক্তিতে সক্ষম না হওয়ায় তারা বৈদেশিক সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। কয়েকটি দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান আঞ্চলিক সংকটের আশঙ্কায় অথবা কয়েকটি দেশ যেমন সাদ্দাম আমলে ইরাক, ইরান আঞ্চলিক আধিপত্যের আকাঙ্খায় প্রতিরক্ষার আয়োজন ক্রমশ বাড়িয়েছে।

ঔপনিবেশিক শাসন মুক্তির পর উন্নয়নের প্রচেষ্টা কম বা বেশি সব দেশে দেখা গেলেও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা সর্বত্র গৃহীত হয়নি, আবার হলেও অনেক জায়গায় তা বজায় থাকেনি। সামরিক শাসন, একদলীয় শাসন, গণতন্ত্রের বহিরঙ্গে গোষ্ঠী শাসন ইত্যাদি চলেছে বিশেষত আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। অবাধ নির্বাচন, স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, বহুদল প্রথা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা থেকে অনেক দেশের মানুষ বঞ্চিত ছিল। ফলে সেখানে অসন্তোষ ও আন্দোলন চলেছে। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে কিছুকাল পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, নাইজেরিয়া, আলজিরিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়া প্রভৃতি দেশে সংশোধিত আকারে গণতন্ত্র ফিরে আসে। আবার গণতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যেও অনেক দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এমনই যে সেখানে পিতৃস্থানীয় কর্তৃত্ব ছাড়া দেশ চলে না। ফিদেল কাস্ত্রো, নেহেরু, জুলিয়াস নিয়েরের, টিটো—জাতীয় ব্যক্তিত্ব যতদিন ক্ষমতায় থাকেন ততদিন দেশের অগ্রগতি সুনিশ্চিত হয়। উপযুক্ত উত্তরাধিকারীর অভাবে সমস্যা দেখা দেয়।

উন্নয়নের তাগিদে মূলধন ও উন্নতমানের প্রযুক্তির প্রয়োজনে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকেই বিদেশের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াই পর্বে দুই শিবিরের প্রতিযোগিতামূলক সহাবস্থানের সময় সুবিধাজনক শর্তে ঋণ ও মূলধনি সাহায্য আদায় করা তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল। তবে উন্নয়নের জন্য বহির্দেশীয় সাহায্য গ্রহণের অর্থ পরনির্ভরতাকে স্বীকার করে নেওয়া এবং ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি সৃষ্টির সহায়ক। লাতিন আমেরিকার উন্নয়ন তাত্ত্বিকরা একে পরনির্ভরতার লক্ষণ বলে মনে করেন। অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন অথবা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, সর্বক্ষেত্রেই তারা উন্নত দেশের দেওয়া ঋণের ওপর নির্ভরশীল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে উন্নত দেশের কাছে তৃতীয় বিশ্বের ঋণের পরিমাণ ছিল ৬০০ মিলিয়ন ডলার। ঋণ, বাণিজ্য-ঘাটতি এবং সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের মন্থরতা ছিল। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে আহুত নির্জোট সম্মেলনে কিউবার প্রধানমন্ত্রী ফিদেল কাস্ত্রো 'The world economic

and social crisis : Its consequences for the developing countries; its gloomy prospects and the need to struggle if we want to survive' নামে এক রিপোর্টে উল্লেখ করেন, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলি সামরিক প্রস্তুতির পেছনে ব্যয় করেছিল ৩৩ বিলিয়ন ডলার, ১৯৮২-র মধ্যে সেই ব্যয় বেড়ে গিয়েছিল পনের শতাংশ। জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষায় খরচ করা হত মাত্র ১ ও ২.৮ শতাংশ, কিন্তু সামরিক খাতে তা ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ। আন্তর্জাতিক বাজরে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ যে সব দেশের আছে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য দেশ যেগুলির বিদেশের বাজারে উদ্বৃত্ত রোজগারের সম্ভাবনা কম তাদের পক্ষে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলা অসম্ভব। স্বাভাবিকভাবে যে সব দেশের উৎপাদন কৃষিজাত এবং আধা শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সেই সব দেশগুলির আর্থিক সংকট চিরসঙ্গী।

৭.৪ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকা

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহমত পোষণ করতে থাকে। এগুলি হল, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের মর্যাদা ও শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতি থেকে বিরত থাকা এবং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, সমস্ত ধরনের ঔপনিবেশিক ও বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার আশু অবসানের স্বপক্ষে অঙ্গীকার করা এবং পরিশেষে আধুনিকীকরণ ও দ্রুত আর্থিক বিকাশের মাধ্যমে দেশীয় শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেষ্ট হওয়া।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্রমশ নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। একটি বিকল্প কূটনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করে এই দেশগুলি ঠাণ্ডা লড়াই জর্জরিত পৃথিবীকে সংঘাতপূর্ণ পরিবেশ থেকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হয়েছে। কোরিয়ার যুদ্ধ, আরব ইসরায়েল দ্বন্দ্ব, ইন্দো-চিন সমস্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির ইতিবাচক ভূমিকা প্রশংসার দাবি রাখে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বের আলোড়নকারী ঘটনাপ্রবাহ সমস্ত বিশ্বের রাজনীতির ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়া ফেলেছে। তৃতীয় বিশ্বের অভ্যুত্থানগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

১। পাশ্চাত্য ঔপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম। এই সমস্ত মুক্তি আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবে এবং সশস্ত্রখাতে প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ শক্তির অবসান শান্তিপূর্ণ সাংবিধানিক পথে ঘটলেও আলজেরিয়া, ভিয়েতনাম, সাইপ্রাস, কেনিয়া, মোজাম্বিক, আঙ্গোলা প্রভৃতি দেশে মুক্তি আন্দোলন সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চরিত্র ধারণ করে।

২। তৃতীয় বিশ্বের স্বাধীন ও আধা-স্বাধীন দেশগুলিতে প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে উৎখাত করার জন্য বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। এই ধরনের বিপ্লবগুলির মধ্যে ছিল চিনের বিপ্লব। চিনের বিপ্লব একদিকে যেমন জাপানী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে হয়েছিল, অন্যদিকে ক্ষমতাসীন জনবিরোধী কুয়ো-মিং তাং শাসনের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। ইরানে মার্কিন মদতপুষ্ট শাহর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

৩। তৃতীয় বিশ্বের তিন-চারটি অভ্যুত্থান ছিল ভিন্ন ধরনের। ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল না এমন কয়েকটি দেশে ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা অপসারণের জন্য অভ্যুত্থান ঘটে। উত্তর ইয়েমেন, ইথিওপিয়া ও আফগানিস্তানের অভ্যুত্থান এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে প্রচণ্ড মূল্য দিতে হয়েছে। বহু মানুষের জীবনহানি ছাড়া তৃতীয় বিশ্বের বিপ্লব বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনতে পারেনি। তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশই অভ্যন্তরীণ সংকট অথবা পারস্পরিক সংঘর্ষে নিমজ্জিত। জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির সংঘাতে অনেক স্থানে স্থিতিশলীতা বিপন্ন হয়ে উঠেছে। লেবানন, মিশর, সুদান, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ ফিলিপাইনস, নাইজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ভারতের কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করেছে। স্বাভাবিকভাবে জাতিগাত দ্বন্দ্ব গণতান্ত্রিক বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক ও বহু পাক্ষিক বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত ও সাংস্কৃতিক চুক্তির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সার্ক (SAARC—South Asian Association for Regional Co-operation), আসিয়ান (ASEAN—Association of South East Asian Nations) ইত্যাদি সংস্থার মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্ব তাদের ভূমিকা সজীব করে রেখেছে।

৭.৫ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে বিশ্ব রাজনীতিতে দ্বিমেরুকরণ হয়। একদিকে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক দেশগুলির শিবির, অন্যদিকে ছিল সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির শিবির। তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি কোনো শিবিরে যোগ না দিয়ে এক স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। এই নীতিকে বলা হয় নির্জোট বা জোট-নিরপেক্ষ নীতি। এই নীতিকে অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি বিশ্বব্যাপী যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল তাকে নির্জোট বা জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনের মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিকামী অথচ দুর্বল দেশগুলি আত্মরক্ষার্থে একটি স্বতন্ত্র বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করে বিশ্বজোড়া ঠাণ্ডা লড়াই থেকে দূরে থেকে অথচ স্বাভাবিক আন্তঃরাষ্ট্র লেনদেনের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করতে সক্ষম হবে। স্বাধীন ভারতের বিদেশ নীতির রূপকার জওহরলাল নেহেরু ও তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী ভি. কে. কৃষ্ণমেননের চিন্তাধারায় এই মৌলিক ধারণার উৎপত্তি।

৭.৬ উদ্ভব

ঔপনিবেশ শাসন মুক্তি ও আফ্রো-এশীয় সংহতির প্রয়াস জোট-নিরপেক্ষতার পটভূমি রচনা করে। আফ্রিকা এশিয়ার শান্তিকামী মানুষের অবস্থান কী হবে সে বিষয়ে নেহেরু বলেন সামান্য কিছু সুবিধার

প্রত্যাশায় বৃহৎ শক্তিগুলির কোনো একটির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার চেয়ে ক্ষতিকারক আমাদের পক্ষে আর কিছুই হতে পারে না। জোট-নিরপেক্ষতা কোনো সুবিধাবাদী অবস্থান নয়। এর অর্থ আত্মনির্ভর, স্বাধীন ও অবিচল একটি দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হওয়া। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত Asian Relations Conference, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায় স্বাধীনতা সংক্রান্ত দিল্লি সম্মেলন, ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে কলোম্বোয় অনুষ্ঠিত পঞ্চশক্তি সম্মেলন এবং বিশেষ করে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসমূহের বান্দুং সম্মেলন-এ ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার ধারণাটি ব্যক্ত হয় এবং উপস্থিত সকলের সমর্থন লাভ করে। বান্দুং সম্মেলনে সদ্য বিপ্লব সফল চিনের পক্ষ থেকে চৌ-এন-লাই-এর উপস্থিতি এবং জোটবদ্ধ কয়েকটি দেশ যেমন, তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরাক, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স প্রভৃতির যোগদান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সম্মেলন থেকে পঞ্চশীল নীতির ঘোষণা করা হয়। এগুলি হল—প্রত্যেকের আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদাবোধ পরস্পরের বিরুদ্ধে আগ্রাসন থেকে বিরত থাকা, অন্যের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকা, সমমর্যাদা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এভাবে বান্দুং সম্মেলনে নির্জোট আন্দোলনের সূচনা হয়।

৭.৭ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

গোষ্ঠী নিরপেক্ষতা বা জোট-নিরপেক্ষতা প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষতা বোঝায় না। যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে যুযুধান কোনো পক্ষের সঙ্গে কোনো সংশ্রব না রাখা হল নিরপেক্ষতা। এর মধ্যে যে নিস্পৃহতা আছে এবং আত্মকেন্দ্রিকতা আছে, জোট-নিরপেক্ষতায় তা অনুসৃত হয় না। উত্তপ্ত যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধেরই সমতুল্য ঠাণ্ডা লড়াইয়ে জোট-নিরপেক্ষ দেশ যেমন অংশ নেবে না, তেমনি পক্ষপাতিত্বও করবে না এই ছিল মূল দৃষ্টিভঙ্গি। জোট-নিরপেক্ষতার আসল চরিত্র হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকা নয়, বরং প্রতিটি সমস্যা, প্রতিটি বিবাদ, প্রতিটি পরিস্থিতিকে তার নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী বস্তুনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করা ও সেই অনুযায়ী স্বাধীন অবস্থান জ্ঞাপন করা। কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অথবা কোনো পক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্য অবস্থান গ্রহণ করা হয় না। জোটবদ্ধ দেশগুলি নিজের স্বার্থের বিনিময়ে ও জোটের স্বার্থকে বড়ো করে দেখতে বাধ্য হয়।

সামরিক জোটমাত্রই তার সদস্যদের বিশেষ একটি অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু জোট-নিরপেক্ষ দেশের কাছে তার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতাই বড়ো কথা। এছাড়া, নিরাপত্তার দিক থেকে জোটবদ্ধ হওয়ার ফলে যে পরিমাণ আশ্বস্ত হওয়া যায়, তার থেকে বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে বিরোধী শিবিরে বৈরিতায়। জোটবদ্ধতা যুদ্ধ বাধাতে চায়, জোট-নিরপেক্ষতা যুদ্ধ পরিহার করতে চায়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, বিরামহীন অস্ত্রপ্রতিযোগিতার বিরোধিতা করে জোট-নিরপেক্ষতা।

নির্জোট বা জোট-নিরপেক্ষতার নীতি শান্তি ও সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলার প্রয়োজনে যে কোনো প্রকারের আধিপত্যের বিরোধী। সাম্রাজ্যবাদী শাসন থেকে মুক্তি, নয়া ঔপনিবেশবাদী শোষণ থেকে সতর্ক থাকা এবং বর্ণবৈষম্যবাদ নির্মূল করা জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির যৌথ সংগ্রামের প্রধান কর্মসূচি।

জোট-নিরপেক্ষতায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় না। তবে সামাজিক ন্যায় ও স্বনির্ভর উন্নয়নের স্বার্থে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র, অবাধ স্বাধীনতা ও পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মধ্যবর্তী কোনো পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

৭.৭.১ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন : কৃতিত্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির কাছে জোট-নিরপেক্ষতার আবেদন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। নির্জোট আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে বিশ্ব রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন স্বীকৃতি আদায়ে সমর্থ হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে বেলগ্রেড সম্মেলনের পর থেকে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সময় অন্তর শীর্ষ সম্মেলন এবং বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ে নিয়মিত যোগাযোগ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনকে একটি বাস্তব রূপ দান করে। স্থানীয় আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী—এই তিন স্তরের পরিস্থিতি এখানে একটি যৌথ কূটনীতির জন্ম দেয় যা আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতিতে তার ছাপ রেখে দিতে সক্ষম হয়েছে। সামরিক জোটের অপছন্দ হলেও নিরপেক্ষতার মূল্য উপেক্ষিত হয়নি। ঠাণ্ডা লড়াই চলাকালীন নির্জোট রাষ্ট্রগুলিকে উভয় শিবিরের মধ্যস্থতা ও করতে হয়েছে যেমন— কোরিয়া, ইন্দোচিনে।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের কৃতিত্ব হল দুই শিবিরের সংঘর্ষের তত্ত্ব অপ্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হওয়া। বিবাদমান দুই মহাশক্তির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে উপনীত হওয়া নির্জোট আন্দোলনের লক্ষ্য পূরণ করেছে। এছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতার কুফল এবং পরমাণু অস্ত্রের বিপদ সম্পর্কে বিশ্বচেতনা জাগ্রত করা ও নিরস্ত্রীকরণের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবত আরও কঠিন হতে পারত যদি না NAM যুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধবিরোধী মনোভাবে একত্রিত হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলির আধিপত্য ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ সম্পূর্ণভাবে অন্তর্হিত না হলেও বৃহৎ শক্তিগুলির দাপট এবং একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও যৌথ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে NAM-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি একযোগে অংশ নিয়েছে। এই আন্দোলনে অংশীদার রাষ্ট্রগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অধিকাংশ সময়ই একটি চাপ সৃষ্টিকারী একক গোষ্ঠী হিসাবে কাজ করেছে। এর ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ বিশেষত সাধারণ সভা অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। নির্জোট আন্দোলনভুক্ত দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য জাগ্রত না হলেও কূটনৈতিক স্তরে নিরন্তর সহযোগিতা ও সংগ্রামের সমন্বয় একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। যুদ্ধোত্তর বিশ্বের ক্ষমতার সমীকরণে ও কাঠামো বিন্যাসে জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের অস্তিত্ব বিশেষ তাৎপর্যপূণ।

৭.৭.২ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিস্তৃতি

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিজুনিতে (Brijuni islands) তিন মহাদেশের প্রতিভূ হিসাবে নেহেরু, নাসের ও টিটো যে বৈঠক করেন, সেখানেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জোট-নিরপেক্ষতাকে দেশভিত্তিক বিদেশনীতির উর্দ্ধে একটি বিশ্বজোড়া আন্দোলনে পরিণত করার।

এই উদ্দেশ্যে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেডে জোট-নিরপেক্ষ ২৫টি দেশের শীর্ষ সম্মেলন বসে। নেহেরু মূলত ঐ সম্মেলনের প্রস্তাব উত্থাপনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন জোট-নিরপেক্ষ দেশ বলতে সেই সব দেশকে বোঝায়, যারা যুদ্ধ, সামরিক জোট ও মোর্চা গঠনের বিরোধী। বেলগ্রেড সম্মেলনে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ঔপনিবেশবাদ ও নয়া-ঔপনিবেশবাদের অবসান, জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হবে। উন্নয়নশীল দেশগুলি যাতে নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারে সেদিকে নজর দেওয়ার প্রস্তাব আনা হয়। এই সম্মেলনে যুদ্ধ ও মানবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে এবং শান্তি ও সহাবস্থানের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলন ছিল জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি।

প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে যে সব প্রস্তাব নেওয়া হয় সেগুলিকে কার্যকর করার জন্য ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ৫ অক্টোবর কায়রো শহরে দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলন হয়। কায়রো সম্মেলনে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় নিরাপত্তা, সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসা এবং নিরস্ত্রীকরণের ওপর। বর্ণবৈষম্যের প্রেক্ষিতে আন্দোলনের সমস্ত শরিকদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। সম্মেলনে স্থির হয় যে ঔপনিবেশ উত্তর তৃতীয় বিশ্বের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে উজ্জীবিত করার জন্য নিজেদের মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিবিড় করতে হবে।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। নেহেরুর জীবনাবসান, নাইজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ, ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আরব-ইজরেয়ল যুদ্ধে আরবদের পরাজয় এবং ভিয়েতনাম যুদ্ধের তীব্রতায় আন্দোলনভুক্ত রাষ্ট্রগুলি অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। পরে টিটোর উদ্যোগে নির্জোট দেশগুলির দার-এস-সালামে মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকের পর স্থির হয় পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনের কর্মসূচি। জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলির শীর্ষ সম্মেলন এরপর ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে লুসাকা, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে আলজিয়ার্স, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলম্বো, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে হাভানায়, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতিটি সম্মেলনে যুদ্ধ, আগ্রাসন, আণবিক যুদ্ধ, অস্ত্রের প্রতিযোগিতা, সাম্রাজ্যবাদ এবং নয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করা হয়েছে।

৭.৭.৩ প্রাসঙ্গিকতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দুই শিবিরের আগ্রাসী মনোভাব প্রতিহত করার উপায় হিসেবে এই জোট-নিরপেক্ষতার ধারণাটির সৃষ্টি হলেও এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল স্বতন্ত্র অর্থাৎ কোনো সামরিক গোষ্ঠীর আওতায় না থেকেও স্বাধীনভাবে বৈদেশিক সম্পর্ক পরিচালনার সম্ভাবনা এবং অধিকার। দুটি সামরিক জোট থাকা বিশ্বশান্তির পক্ষে বিপজ্জনক। আবার এর মধ্যে একটি জোট ভেঙে গিয়ে অপরটি জোটে থাকলেও সমস্ত জাতি রাষ্ট্রের নিরাপদ মনে করার কোনো কারণ নেই, বরং যত বেশি সংখ্যক দেশ

ঐ জোটের বাইরে থাকবে তাদের সমষ্টিগত গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। প্রতিদ্বন্দ্বিতা নয় প্রতিবাদী ভূমিকার স্বার্থে এটা অত্যন্ত জরুরি।

ঠাণ্ডা লড়াই মূলত রাজনৈতিক সামরিক সংঘর্ষের এক বাতাবরণ। নির্জোট আন্দোলন সেই বাতাবরণকে বর্জনীয় মনে করেছে, বিপজ্জনক মনে করেছে। নির্জোট দেশগুলি প্রকৃতপক্ষে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ঔপনিবেশিক শাসনমুক্ত উন্নয়নকামী মানুষের আবাসভূমি। নির্জোট থাকার অর্থ শোষণকারী প্রভুত্বকামী গোষ্ঠীর থেকে আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার সংগ্রাম। বিশ্বায়ন তৃতীয় দুনিয়ার সমস্ত দেশেই নতুন এক সংকটের জন্ম দিয়েছে। জাতীয় উন্নয়ন থেকে জাতীয় নিরাপত্তা এমনকি জাতীয় সংস্কৃতি বিশ্বায়নের চাপে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী একটি বিশ্বজোড়া মঞ্চকে বর্তমানে আরও বেশি প্রয়োজন তৃতীয় বিশ্বের ।

৭.৮ উপসংহার

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের মর্যাদা ও শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঠাণ্ডা লড়াই রাজনীতি থেকে বিরত থেকে এবং জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমস্ত ধরনের ঔপনিবেশিক ও বর্ণবৈষম্যমূলক ব্যবস্থার আশু অবসানের স্বপক্ষে অঙ্গীকার করে এবং পরিশেষে আধুনিকীকরণ ও দ্রুত আর্থিক বিকাশের মাধ্যমে দেশীয় শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেষ্ট হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখার ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতার আবেদন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুনিশ্চিত করা, ঔপনিবেশবাদ ও নয়া ঔপনিবেশবাদের অবসান, জাতি ও বর্ণের বৈষম্যের অবসান ইত্যাদির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

৭.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের ধারণাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

২। তৃতীয় বিশ্বের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করুন।

৩। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তৃতীয় বিশ্বের ভূমিকার পরিচয় দিন।

৪। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন বলতে কী বোঝায়? কীভাবে এই আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল?

৫। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৬। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের কৃতিত্ব বর্ণনা করুন।

৭। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের বিভিন্ন সম্মেলনগুলির বিবরণ দিন।

৮। জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতা বিশ্লেষণ করুন।

৭.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

২। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)*, কলকাতা, ২০০৭।

৩। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—*আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০১০।

৪। মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়—*সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০২০।

একক-৮ ❑ সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের সংকট : সূচনা ও পরিণতি

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন :

- স্টালিনের নেতৃত্বে কীভাবে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপে রুশ প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এর পেছনে স্টালিনের উদ্দেশ্য কী ছিল।
- ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে স্টালিনের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতীকরণ প্রক্রিয়া এক সার্বিকরূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু এই প্রক্রিয়া কৃত্রিম, আরোপিত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক নিয়ন্ত্রণবাদী ও আমলাতান্ত্রিক হওয়ায় স্টালিনের মৃত্যুর পর কিভাবে ইউরোপের পরিস্থিতি সংকটজনক হয় এবং পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয়।
- আশির দশকে মাঝামাঝি কিভাবে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হয়।

৮.১ ভূমিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থানগত পরিবর্তন হয়। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রধান পরিচালক ও বিশ্বের দুটি মহাশক্তিধর দেশের অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পর স্টালিনের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য বলবৎ হয়। স্টালিনের এই প্রয়াস আপাতদৃষ্টিতে সফল হলেও এর পরিণতি শুভ হয়নি। হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডে সোভিয়েত আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু হয়। সমগ্র পূর্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য অর্জন করে। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বিলুপ্ত হয়।

৮.২ পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা : স্টালিনীকরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতির বৃহত্তর আঙিনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থানগত পরিবর্তন সূচিত হয়। যুদ্ধের পূর্বে সোভিয়েত রাশিয়া ছিল বিশ্ব রাজনীতিতে নিঃসঙ্গ ও জার্মান ষড়যন্ত্রের শিকার। যৌথ নিরাপত্তা রক্ষা ও ফ্যাসিস্ত বিরোধী মঞ্চ গঠনে সোভিয়েত আহ্বান পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় স্টালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বাধ্য হয়ে সোভিয়েত রাশিয়া জার্মানীর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে জার্মানী এই চুক্তি লঙ্ঘন করে রাশিয়া আক্রমণ করলে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সঙ্গে মিত্র চুক্তি সম্পাদন করে। যুদ্ধ জয়ের গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে রুশ কর্ণধার স্টালিন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট-এর সঙ্গে যুদ্ধ পরবর্তী ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সূত্র অন্বেষণ করতে ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হন। এরপর যুদ্ধের শেষলগ্নে রুজভেল্টের মৃত্যু ও চার্চিলের নির্বাচনী পরাজয়ের ফলে স্টালিন বিশ্বরাজনীতিতে প্রধানতম ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলেন। রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রধান পরিচালক ও বিশ্বের দুটি মহাশক্তিধর দেশের অন্যতম হিসাবে বিবেচিত হয়।

৮.২.১ পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য স্থাপন : উদ্দেশ্য

যুদ্ধজনিত পরিস্থিতিতে স্টালিন পূর্ব ইউরোপে রুশ প্রাধান্য স্থাপনে আগ্রহী হয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল বিজিত অঞ্চলের ওপর রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপন যুক্তিযুক্ত। তবে স্টালিন ব্যক্তিগতভাবে সোভিয়েত প্রভাব সম্প্রসারণে আগ্রহী হলেও কোনো একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেননি। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার প্রয়োজনে স্টালিন পূর্ব ইউরোপে নিরাপত্তার জাল রচনা করতে চেয়েছিলেন। এছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত সোভিয়েত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের জন্য পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির সম্পদ সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে নিয়োজিত করা সহজ হবে এবং সোভিয়েত শিল্পজাত পণ্যসম্ভারের বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। পূর্ব ইউরোপে একটি অনুগত প্রভাবাধীন বলয় থাকলে সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক

বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটবে এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেওয়া সম্ভব হবে। সাম্যবাদের প্রসার ছাড়া ও বিশ্বরাজনীতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার শক্তিবৃদ্ধি ঘটবে।

পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি প্রসঙ্গে পিটার কালভোকোরেসি (Peter Calvocoressi) মনে করেন যে ইউরোপীয় মহাদেশে পরস্পর-বিরোধী প্রভাবাধীন অঞ্চল স্থাপন ছিল একটি ঐতিহাসিক ধারার পরিণতি ও আকস্মিক ঘটনা। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী রুজভেল্ট ও চার্চিল ইয়াল্টা সম্মেলনে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করায় রাশিয়ার পক্ষে পূর্ব ইউরোপে বিনা বাধায় ক্ষমতা প্রসার করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রসার শুধুমাত্র পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের নমনীয় নীতির পরিণতি ছিল না, যুদ্ধ পরবর্তী বাস্তব পরিস্থিতিতে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়াকে বাধাদান করা অসম্ভব ছিল। অধ্যাপক ডেভিড হরোউইজ (David Horowitz)-এর মতে সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ব ইউরোপে ইচ্ছাকৃতভাবে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। ঠাণ্ডা লড়াই, রাজনীতির আগমন ও পাশ্চাত্য দেশগুলির তীব্র বিদ্বেষ সোভিয়েত রাশিয়াকে ক্রমশ অনমনীয় করে তোলে। তা না হলে সম্ভবত রাশিয়া পূর্ব-ইউরোপে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ কিছুটা শিথিল করতে পারত।

৮.৩ সোভিয়েতীকরণের প্রক্রিয়া : প্রথম পর্যায় (১৯৪৫-৪৭)

স্টালিনের নেতৃত্বে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতীকরণের প্রথম পর্বে পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্ট পার্টি অ-কমিউনিস্টদের সঙ্গে যৌথভাবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়াল্টা সম্মেলনে পোল্যান্ডে একটি সর্বদলীয় যৌথ মন্ত্রীসভা গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ক্রমশ অ-কমিউনিস্টদের প্রভাব সংকুচিত হতে থাকে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমিউনিস্ট ও সমর্থক দলগুলির মোর্চা অধিকাংশ আসন লাভ করে। পোলিশ পেজেন্ট পার্টি ও পোলিশ সোস্যালিস্ট ওয়ার্কাস পার্টি প্রভৃতি অ-কমিউনিস্ট দলগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। রোমানিয়ায় নাৎসী সমর্থক শাসকদের ক্ষমতাচ্যুত করার পর রাজা মাইকেল ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে স্টালিন মাইকেলকে কমিউনিস্টদের নিয়ে একটি জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট সরকার গঠনের নির্দেশ দেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধীদের বিলুপ্ত করে এবং অনুগতদের নিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ রোমানিয়ান ওয়ার্কাস পার্টি গঠন করে। বুলগেরিয়াতে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বরে সোভিয়েত অনুগামী স্বদেশভূমি ফ্রন্ট (Fatherland Front) গঠিত হয়। এই ফ্রন্টে প্রথমে কমিউনিস্টদের সঙ্গে অ-কমিউনিস্টদের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও ক্রমশ বিরোধীদের নির্মূল করা হয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জর্জি ডিমিট্রিভ-এর নেতৃত্বে একটি সোভিয়েত অনুগামী সাম্যবাদী সরকার ক্ষমতাসীন হয়। হাঙ্গেরিতে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত উদ্যোগে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠিত হয়। এই সরকারে কমিউনিস্ট ও অ-কমিউনিস্ট দলগুলির সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি হাঙ্গেরির সংসদে ১৭ শতাংশ আসন পেয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে। রাকেটিস প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন, আর ইমরে নেগি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্ব পেলেন। শেষ পর্যন্ত রাকেটিসের নেতৃত্বে সংযুক্ত ওয়ার্কার্স পার্টি ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকরণে হাঙ্গেরিয়ান গণপ্রজাতন্ত্র গঠিত হয়।

৮.৩.১ দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৪৮-১৯৫৩)

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদী তৎপরতা প্রতিহত করার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি নীতি ঘোষণা করলে সোভিয়েত রাশিয়ার মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ়করণের কর্মসূচি গৃহীত হয়। পাশ্চাত্য দেশগুলির বিরুদ্ধে সংঘাতনীতি অনুসৃত হয়।

পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়ায় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ছিল সবচেয়ে মজবুত এবং এখানে সোভিয়েত প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা শিথিল। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি ৩৮ শতাংশ ভোট পায়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চেক্ কমিউনিস্ট পার্টি অ-কমিউনিস্ট দলগুলির প্রতি সহাবস্থানমূলক মনোভাব গ্রহণ করেছিল কিন্তু ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে চেক্ সরকার মার্শাল পরিকল্পনার শর্তাবলী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিলে সোভিয়েত ইউনিয়ন শঙ্কিত হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্টালিনের নির্দেশে চেক্ প্রধানমন্ত্রী গটওয়াল্ড বিরোধী দলকে উৎখাত করে একদলীয় কমিউনিস্ট শাসন কায়েম করেন। রাষ্ট্রপতি রেনেস পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কমিউনিস্ট শাসন বলবৎ হয়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে গভীর আশঙ্কার সৃষ্টি হয় এবং দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলি সাম্যবাদের প্রসার প্রতিরোধে সচেতন হয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্কের অবসান ঘটে।

৮.৩.২ সোভিয়েতীকরণের চরিত্র

১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব ইউরোপে ফিনল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া অন্যত্র কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। পূর্ব ইউরোপে সাম্যবাদী শাসনের চরিত্রে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, এগুলির কোনোটাই গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকটি দেশেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীগুলিকে রাশিয়ার প্রতি অনুগত করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট দলে বিশ্বাসভাজন ও অনুগত ব্যক্তিরাই স্থান পেয়েছিলেন, অন্যদের অপসারিত করা হয়েছিল।

স্টালিন পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত অনুগত রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলবৎ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করেন। রাশিয়ার সঙ্গে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংহতি বিধানের জন্য ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে পারস্পরিক আর্থিক সহায়তা পরিষদ (Council for Mutual Economic Assistance) গঠিত হয়। এই সংস্থা কমেকন (Comecon) নামে পরিচিত। মার্শাল পরিকল্পনার প্রভাব থেকে পূর্ব ইউরোপের অনুগামী দেশগুলিকে রক্ষার জন্য এই ব্যবস্থা করা হয়। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে সোভিয়েত অনুকরণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। দ্রুত শিল্পায়নের নীতি গৃহীত হয় এবং কৃষি ব্যবস্থায় যৌথ খামার ব্যবস্থার নীতি অনুসৃত হয়।

এইভাবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতীকরণ প্রক্রিয়া এক সার্বিকরূপ গ্রহণ করেছিল। এই ব্যবস্থা ছিল কৃত্রিম, আরোপিত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক, নিয়ন্ত্রণবাদী ও আমলাতান্ত্রিক। Roy Medvedev তাঁর *Let History Judge* গ্রন্থে এই মত প্রকাশ করেন যে স্টালিন পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট নেতাদের অনুগামী সেবক রূপে গণ্য করতেন এবং সমাজতন্ত্রী শিবিরের

পরিধি বিস্তার নিজ ব্যক্তিগত মালিকানার প্রসার হিসাবে বিবেচনা করতেন, এজন্য পূর্ব ইউরোপের কমিউনিস্ট দেশগুলির কার্যকলাপে সুবিধামতো হস্তক্ষেপ করতেন। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক স্বাতন্ত্রকে স্টালিন গুরুত্ব দিতেন না। স্বাভাবিকভাবে অমানবিক স্টালিনীকরণ পুর্ব ইউরোপের জনগণ এমনকি কমিউনিস্ট দলের নেতা ও সদস্যদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। স্টালিনের মৃত্যুর পর (১৯৫৩) পূর্ব ইউরোপের পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে। পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

৮.৪ নিস্টালিনীকরণ (De-Stalinization)

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব ইউরোপের সেভিয়েতীকরণে স্টালিন শৈথিল্য দেখাননি। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে স্টালিন মারা গেলে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় নেতা ক্রুশেচভ নিজ ক্ষমতা সুদৃঢ় করতে সক্ষম হন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম অধিবেশনে ক্রুশেচভ শুরু করেন নিস্টালিনীকরণ, অর্থাৎ স্টালিনের চিন্তাভাবনাকে অপ্রাসঙ্গিক করেন, মার্কসবাদের সরলীকরণ শুরু করেন, কট্টর পুঁজিবাদ বিরোধিতা থেকে সোভিয়েত রাশিয়াকে সরিয়ে এনে চালু করেন 'তিন নীতির তত্ত্ব'—শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক উত্তরন। ক্রুশেচভের এই আদর্শগত পরিবর্তিত অবস্থানের প্রভাব সোভিয়েত বিদেশনীতির ওপর পড়েছিল। ক্রুশেচভ চেষ্টা করেন 'ওয়ারশ চুক্তি'-কে একটি সামরিক জোটে পরিণত করতে।

৮.৪.১ পূর্ব ইউরোপে নিস্টালিনীকরণের প্রভাব

ক্রুশেচভের এই নিস্টালিনীকরণের প্রভাব পড়েছিল পূর্ব ইউরোপে। নিরাপত্তা বলয় তৈরি করতে গিয়ে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির মতো দেশকে স্টালিন সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিলেন, চাপিয়ে দিয়েছিলেন ভারী শিল্প ও সামরিকায়ণের বোঝা। এর ফলে ভোগ্যপণ্য অর্থনীতির যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে স্টালিন বিরোধিতা শুরু হয়েছিল। স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশেচভ যখন সোভিয়েতের ভেতরেই স্টালিনের সমালোচনা করেন, স্বাভাবিকভাবে তা পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে রুশ নিয়ন্ত্রণ বিরোধিতার সুযোগ করে দেয়।

৮.৪.২ পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির বিদ্রোহ

পূর্ব ইউরোপের অসন্তোষ প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ নেয় পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে এই দুটি বিদ্রোহ ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জুন মাসে পোল্যান্ডের শিল্পনগরী পোজনানে হাজার হাজার শ্রমজীবি মানুষ অভ্যুত্থান শুরু করে। পোল্যান্ড থেকে সোভিয়েত সেনাপতিদের অপসারণের দাবি জানানো হয়। স্টালিনের নির্দেশে বিতাড়িত জাতীয়তাবাদী কমিউনিস্ট নেতা গোমুলকা পুনরায় পার্টিতে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। ক্রুশেচভ পোল্যান্ডে গিয়ে গোমুলকার সঙ্গে আপসরফায় উপনীত হন। গোমুলকা সোভিয়েত শিবির থেকে পোল্যান্ডকে সরিয়ে নেওয়া থেকে বিরত হন।

হাঙ্গেরিতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। হাঙ্গেরিতে ইমরে নেগি-র নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে অ-কমিউনিস্ট দলের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৩০ অক্টোবর নেগি সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে হাঙ্গেরির জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষা ও হাঙ্গেরি থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি আদায় করেন। ১লা নভেম্বর হাঙ্গেরি থেকে সোভিয়েত সেনার অপসারণ শুরু হলে নেগি ওয়ারশো সামরিক চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় সোভিয়েত রাশিয়া শঙ্কিত হয়ে ওঠে, কারণ রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন ও সামরিক দিক থেকে নিরপেক্ষ হাঙ্গেরি পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত নিরাপত্তা ব্যবস্থার পক্ষে বিপর্যয়ের কারণ হবে। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত রাশিয়া সক্রিয় সামরিক প্রতিরোধের নীতি গ্রহণ করে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে ৪ঠা নভেম্বর হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্ট অভিযান করে। নেগি ক্ষমতাচ্যুত হন এবং জানস কাদার-এর নেতৃত্বে একটি অনুগত সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। হাঙ্গেরির বিদ্রোহ দমন পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য সাম্যবাদী দেশগুলিকে সংযত ও আজ্ঞাবাহী আচরণ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়া সোভিয়েত নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব ইউরোপীয় রাজনৈতিক শিবিরে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এবং নিজস্ব স্বাতন্ত্র অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর ছিল।

৮.৪.৩ প্রাগ-বসন্ত (১৯৬৮) Prague Spring

হাঙ্গেরি বিদ্রোহকে দমন করা সম্ভব হলেও পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ক্রমিক অর্থনৈতিক সংকটের কারণে সেই দেশগুলিতে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ষাটের দশকে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া সোভিয়েত বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে। রোমানিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান চেসেস্কু পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত কর্তৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং বিদেশ নীতি পরিচালনায় নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করেন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রীকরণের সংগ্রাম এক প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যুত্থান শুধুমাত্র সোভিয়েত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে ছিল না, স্টালিন প্রবর্তিত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে নিয়োজিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া পূর্ব ইউরোপের সবচেয়ে শিল্পোন্নত রাষ্ট্ররূপে পরিচিত ছিল। কিন্তু রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির চাপে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার ক্রমিক অবনতি ঘটে। প্রখ্যাত চেক্ অর্থনীতিবিদ ড. ওটো সিক আমূল সংস্কারের মাধ্যমে স্থবির চেক্ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার পরিকল্পনা পেশ করেন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সংস্কারের সমর্থক আলেকজান্ডার ডুবচেক্ চেক্ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিল মাসে ডুবচেক সরকার যে রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন তাতে বলা হয় যে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা রূপায়িত করা হবে। এই কর্মসূচিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিব্রত বোধ করে এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে ২১আগস্ট সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ওয়ারশ্ গোষ্ঠীভুক্ত অন্যান্য দেশের যৌথ সামরিক হস্তক্ষেপে চেক্ জাতিকে দমন করে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সশস্ত্র হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে রোমানিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া বিরোধিতা করে। ষাটের দশকে চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যুত্থান সফল না হলেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের যে

বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে আশির দশকের শুরু থেকে পূর্ব ইউরোপে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহের চাপে শুধু চেকোশ্লোভাকিয়া নয়, সমগ্র পূর্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য অর্জন করে। রাশিয়ার পক্ষে আর হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয়নি। এইভাবে দেখা যায় পূর্ব ইউরোপের স্টালিনীকরণ ও সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা চার দশকের বেশি স্থায়ী হয়নি। আশির দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হলে পূর্ব ইউরোপের জনগণের শান্তিপূর্ণ গণ-অভ্যুত্থানের গতি অপ্রতিরোধ্য হয়। সর্বত্রই সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয় এবং গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৮.৫ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

বিশ্বের প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন পঁচাত্তর বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই বিলুপ্ত হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পতনের মূলে ছিল একদলীয় স্বৈরতন্ত্র, ব্যর্থ অর্থনীতি ও সাম্রাজ্যবাদী পররাষ্ট্রনীতি। স্টালিনের সময় থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি চরম আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ববাদের আধারে পরিণত হয়। বিভিন্ন স্তরের দলীয় কর্তারা নিজেদের বিপুল ক্ষমতা সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আধিপত্য বজায় রাখতে বেশি সচেষ্ট হয়েছিল। গণসমর্থন ছাড়া কোনো শাসন সুদৃঢ় হওয়া সম্ভব নয়।

দেউলিয়া অর্থনীতি সোভিয়েত শাসনকে দুর্বল করে তোলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় গড় আয়ের শতকরা তিরিশ ভাগ ব্যয় হত সামরিক প্রয়োজনে। এর ফলে সামরিক শক্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেলেও ভোগ্যপণ্য ও শিল্প উৎপাদনে বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির অভাব দেখা দেয়। সংস্কারের জরুরি প্রয়োজন উপলব্ধি করে গর্বাচেভ দুটি নীতিগত পরিবর্তন ঘোষণা করেন। পররাষ্ট্র নীতির পাশাপাশি স্বদেশে গর্বাচেভ পুনর্গঠন ও মুক্তচিন্তার নীতি ঘোষণা করে কমিউনিস্ট শাসনকে গণতান্ত্রিক ও মানবিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ঘোষিত নীতিগুলি হল পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত। গর্বাচেভের সংস্কারের প্রয়াস সোভিয়েত রাজনীতিতে সংস্কারপন্থী ও রক্ষণশীল প্রবণতার মাত্রা বৃদ্ধি করে। তীব্র সংস্কারপন্থীরা গর্বাচেভের নম্র সংস্কারবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে সন্তুষ্ট হননি, আবার রক্ষণশীল গোষ্ঠী তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন কারণ গর্বাচেভের নীতি দলীয় নিয়ন্ত্রণবাদীদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির পক্ষে আশঙ্কার কারণ হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পর রাশিয়া সম্প্রসারণের দিকে অগ্রসর হয়। স্টালিন পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত আধিপত্য বলবৎ করেন। এই প্রচেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে সফল হলেও এর পরিণতি ছিল ভয়ঙ্কর। হাঙ্গেরি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও পোল্যান্ডে সোভিয়েত আধিপত্যের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু হয়। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রভূত্ব বিধ্বস্ত হওয়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্যগুলিতেও এর প্রভাব পড়ে। গর্বাচেভ সোভিয়েত সংহতি রক্ষায় সচেষ্ট হলে শেষ রক্ষা হয়নি। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটে।

৮.৬ উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেভিয়েত রাশিয়া সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রধান পরিচালক ও বিশ্বের দুটি মহাশক্তিধর দেশের অন্যতম হিসেবে বিবেচিত হয়। নানা কারণে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলির ওপর সোভিয়েত রাশিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজনীয় মনে করেছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব ইউরোপে স্টালিনের নেতৃত্বে ফিনল্যান্ড ও যুগোশ্লাভিয়া ছাড়া অন্যত্র কমিউনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়। স্টালিন পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত অনুগত রাষ্ট্র ব্যবস্থা বলবৎ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন করেন। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েতীকরণ প্রক্রিয়া এক সার্বিক রূপ গ্রহণ করে। তবে এই ব্যবস্থা ছিল কৃত্রিম, আরোপিত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক। নিয়ন্ত্রণবাদী ও আমলাতান্ত্রিক। পূর্ব ইউরোপের দেশগুলির জাতীয় ও আর্থ-সামাজিক স্বাতন্ত্র গুরুত্ব না পাওয়ায় স্টালিনের মৃত্যুর পর পূর্ব ইউরোপের পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠে। স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চেভ সোভিয়েতের ভেতরেই স্টালিনের সমালোচনা করলে স্বাভাবিকভাবে তা পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে রুশ নিয়ন্ত্রণ বিরোধিতার সুযোগ করে দেয়। হাঙ্গেরি বিদ্রোহকে দমন করা সম্ভব হলেও ষাটের দশকে চেকোশ্লোভাকিয়া ও রোমানিয়া সোভিয়েত বিরোধী মনেভাব গ্রহণ করে। চেকোশ্লোভাকিয়ার অভ্যুত্থান সফল না হলেও গণতান্ত্রিক সংগ্রামের যে বলিষ্ঠ দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল—তার ঐতিহ্য অনুসরণ করে আশির দশকে থেকে শুরু করে পূর্ব ইউরোপে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিদ্রোহের চাপে সমগ্র পূর্ব ইউরোপের গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য অর্জন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হয়।

৮.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় স্টালিনের ভূমিকা কী ছিল?

২। পূর্ব ইউরোপে নিস্টালিনীকরণের প্রভাব কী ছিল?

৩। কিভাবে আশির দশকের মাঝামাঝি সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সংকটের সম্মুখীন হয়?

৪। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের কারণ কী ছিল?

৮.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। Robert Rienow—*Contemporary International Politics*, 1961।

২। John W. Young and John Kent—*International Relations since 1945*, Oxford, 2013।

৩। প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়—*আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০১০।

পর্যায় ৩ : উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নের প্রেক্ষিত

একক-৯ ❑ বিশ্ব বিভাগ : উত্তর এবং দক্ষিণ একটি পর্যালোচনা

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়।
- বিংশ শতাব্দীর সূচনায় পৃথিবীর দেশগুলি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিরিখে উন্নত ও অনুন্নত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল।
- অনুন্নয়নের কারণ কী ছিল।

- উন্নয়নশীল দুনিয়ায় প্রয়োজনীয় উপাদান মূলধন ও উন্নতমানের প্রযুক্তির অভাব পূরণের জন্য অনেক দেশকেই বিদেশের সাহায্য নিতে হয়েছে এবং ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশক নয়া ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল।
- ১৯৭০-এর দশক থেকেই পুঁজিবাদের সংকটের সূচনা হয়।
- সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদ অন্য পথ গ্রহণ করে এবং সূচনা হয় পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের।
- ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নয়া-উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আক্রমণ শুরু হওয়ায় পর থেকে বিশ্বে গরীব দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.১ ভূমিকা

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর দেশগুলি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিরিখে উন্নত ও অনুন্নত—এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন দেশগুলিতে উন্নয়নের প্রয়াস শুরু হয়। সেই থেকে এই দেশগুলিকে অনুন্নত না বলে উন্নয়নশীল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উন্নত দেশগুলি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থিত হওয়ায় এদের সাধারণভাবে 'উত্তর' এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 'দক্ষিণ' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধনতন্ত্রী শিল্পে অগ্রগামী দেশগুলি 'প্রথম দুনিয়া' এবং উন্নয়নের পথে দেরিতে অবতীর্ণ দেশগুলি 'তৃতীয় দুনিয়া' হিসাবে পরিগণিত।

৯.২ উন্নয়নের সংজ্ঞা

উন্নয়ন শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সাধারণভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হলেও বর্তমানে উন্নয়নের অর্থ বলতে বোঝায় সামগ্রিক অগ্রগতি অর্থনীতি যার নিয়ন্তা। শুধুমাত্র উর্দ্ধমুখী উৎপাদন নয়, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ-প্রগতির সুষম বৃদ্ধিই উন্নয়ন সূচিত্র করে যার প্রতিশব্দ হল মানবিক বিকাশ। মানবিক উন্নয়নকে সংখ্যায়িত করতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়ন প্রকল্প অনুসৃত চারটি প্রধান সূচক যেমন মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনের হার, (Per capita GDP), জন্মলগ্নে প্রত্যাশিত আয়ু, বিদ্যালয় শিক্ষার মান এবং বয়স্ক সাক্ষরতা গুরুত্ব পেয়েছে।

৯.৩ উন্নত ও উন্নয়নশীল দুনিয়া

তত্ত্বগতভাবে এবং আইনি ও কূটনৈতিক রীতি অনুসারে এর অংশীদার সব রাষ্ট্র সমান সার্বভৌম মর্যাদাসম্পন্ন হলেও ক্ষমতা বা সমর্থের বিচারে সব রাষ্ট্র সমান প্রভাবশালী নয়। আকার, আয়তন, অবস্থান

ও প্রাকৃতিক সম্পদের তারতম্য ছাড়া যে অর্থনৈতিক শক্তির জোরে রাষ্ট্র তার বৈদেশিক সম্পর্ককে নিজের আয়ত্ত্বে রাখতে পারে, আন্তঃরাষ্ট্রীয় কূটনীতিতে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে—সেই অর্থনৈতিক শক্তি সব রাষ্ট্রের সমানভাবে করায়ত্ত নয়। ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে রাষ্ট্রগুলি দুভাগে বিভক্ত—ধনী ও দরিদ্র, সুতরাং উন্নত ও অনুন্নত, সুতরাং শক্তিমান এবং দুর্বল। তবে এই মোটা দাগের পার্থক্য (great divide) অবশ্যই এক সরলীকৃত চিত্র উপস্থাপন করে, অর্থনৈতিক কৃতিত্বের ভিত্তিতে কোনো কোনো রাষ্ট্র সামনের সারিতে চলে আসে, অন্যেরা পিছিয়ে পড়ে এবং সর্বকালেই স্বল্প সংখ্যক রাষ্ট্র শীর্ষস্থান দখল করে নেয়।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর দেশগুলি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির নিরিখে উন্নত ও অনুন্নত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উন্নত দেশগুলি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শিল্প বিপ্লবের কল্যাণে উৎপাদনের ব্যাপকতা ও বৈচিত্র বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করেছে। এই জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে। সেই সঙ্গে যুক্ত হয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য থেকে নিয়মিত সম্পদ আহরণ। এভাবেই তাদের উন্নত হয়ে ওঠা এবং পৃথিবীর অবশিষ্ট অংশের অনুন্নত থেকে যাওয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে নয়া জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ সদ্য স্বাধীন দেশগুলিতে অগ্রসর দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উন্নয়নের প্রয়াস শুরু হয়। সেই থেকে এই দেশগুলিকে অনুন্নত না বলে উন্নয়নশীল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির ভৌগোলিক অবস্থান আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশে। উন্নত দেশগুলি উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপে অবস্থিত হওয়ায় এদের সাধারণভাবে 'উত্তর' ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে 'দক্ষিণ' (North and South) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ধনতন্ত্রী শিল্পে অগ্রগামী দেশগুলি 'প্রথম দুনিয়া' এবং উন্নয়নের পথে দেরিতে অবতীর্ণ দেশগুলি 'তৃতীয় দুনিয়া' হিসাবে পরিগণিত।

৯.৪ উন্নয়নের আনুসঙ্গিক সমস্যা

অনুন্নয়নের কারণগুলির মধ্যে শ্রমের উৎপাদিকতায় ঘাটতি ছাড়া কতকগুলি প্রয়োজনীয় অনুপুরক উপাদানের (complementary factor) অভাব যেমন শারীরিক পুষ্টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কারিগরি দক্ষতা, মূলধনি সরঞ্জামের যোগান, উপযুক্ত পরিকাঠামো, পরিচালনায় অভিজ্ঞতা ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সঙ্গে আরও প্রয়োজন সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তে ন্যায়সঙ্গত শ্রম সম্পর্ক এবং উৎপাদনের উপাদানগুলির ওপর জাতীয় নিয়ন্ত্রণ। উন্নয়নশীল দুনিয়ায় অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে সীমাবদ্ধতা থাকায় উন্নয়ন আশানুরূপ সম্ভব হয়নি। যেখানে সেই দুর্বলতা নেই যেমন সিঙ্গাপুর কিংবা তাইওয়ান, কিউবা অথবা তানজানিয়া-সেখানে উন্নয়ন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় বা বহুজাতিক রাষ্ট্রে উন্নয়নের কল্যাণ সমানভবে বণ্টিত না হলে, আঞ্চলিক অথবা সংখ্যালঘু জাতি, কিংবা সম্প্রদায়গত বিরোধ জাতীয় সংহতিকে বিপন্ন করতে পারে।

উন্নয়নশীল দুনিয়ায় দুটি অনুপূরক উপাদান—মূলধন ও উন্নতমানের প্রযুক্তির অভাব পূরণের জন্য অনেক দেশকেই বিদেশের সাহায্য নিতে হয়েছে। উন্নয়নের জন্য বর্হির্দেশীয় সাহায্য গ্রহণের অর্থ পরনির্ভরতাকে

স্বীকার করে নেওয়া এবং ঋণে ফাঁদে জড়িয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হওয়া। লাতিন আমেরিকার উন্নয়ন তাত্ত্বিকরা একে পরনির্ভরতার লক্ষণ বলেন। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে অতিরিক্ত বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ যে সব দেশে আছে (যেমন তেল রপ্তানিকারক দেশগুলি) সেগুলি বাদ দিলে, অন্যান্য দেশের উৎপাদন যেহেতু কৃষিজাত এবং আধা-শিল্পজাত পণ্যের মধে সীমাবদ্ধ, সেহেতু বিদেশের বাজারে উদ্বৃত্ত রোজগারের সম্ভাবনা কম। উন্নয়নের প্রয়োজনে এবং অর্থনৈতিক সংকটমোচনের তাগিদে অনেক দেশকেই বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের নির্দেশিত কাঠামোগত পরিবর্তনে বাধ্য হতে হয়। উন্নয়ন এবং পরনির্ভরতা এভাবে সমান্তরাল হয়ে দাঁড়ায়।

৯.৫ উন্নত দুনিয়া : বিশ্ব পুঁজিবাদ : মার্কিন আধিপত্য

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে ঔপনিবেশিক শোষণের জাল বিস্তার করে তার ফলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি অন্ততঃ দুই দশককাল ধরে বেশ কিছুটা সমৃদ্ধির আস্বাদ পায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্রচণ্ড অর্থনৈতিক মন্দার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির চরম পচনশীলতা প্রকট হয়ে ওঠে। এই মন্দা ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে একমাত্র সমাজতন্ত্রী সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়া সাম্রাজ্যবাদী বাজারের সঙ্গে যুক্ত এবং সম্পর্কিত পৃথিবীর সমস্ত দেশকে আক্রান্ত করে। এই প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদীর একটি 'বিকল্প অর্থনৈতিক রণনীতি'র আশ্রয় নেয় অস্বাভাবিক সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কেইনস্ (John Maynard Keyens) পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বমূলক কাঠামোর মধ্যেই পুঁজিবাদের প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশক নয়া ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল তার কারণ এই কেনেসীয় বিধানের উপর ভিত্তি করেই সরকারি বাজেটে ঘাটতি এবং বিদেশি ঋণের মারফৎ অর্থনীতিতে একটা আপাত সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিল।

৯.৬ পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকীকরণ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন অন্যান্য রাষ্ট্রের অর্থনীতি বিপর্যস্ত, তখন তার অক্ষুণ্ণ আর্থিক সম্পদ এবং যুদ্ধের কল্যাণে ঋণ দান ও রসদ সরবরাহ থেকে প্রাপ্ত বিপুল আয়ের জোরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট এক অভাবনীয় প্রতিপত্তি অর্জনে করে। যুদ্ধোত্তর বিশ্ব অর্থনীতির ধরন ধারণ নির্ণয়ে দেখা যায় মার্কিন নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রাধান্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশ্বে যে 'dollar shortage' দেখা দিয়েছিল, তার ফলেই পশ্চিম ইউরোপের আমেরিকীকরণ সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে এই সময় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অভাব দেখা দিয়েছিল। অপরদিকে সেই সামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করার জন্য যে Foreign exchange-এর প্রয়োজন ছিল তারও অভাব দেখা দিয়েছিল। Foreign exchange-এর এই অভাবকে 'dollar shortage' বলা হয়। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপের এই সমস্যার সমাধান করতে পারত। আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে সাহায্য করার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে পশ্চিম ইউরোপে তার প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হবার স্বল্পকাল আগেই পশ্চিম ইউরোপের আমেরিকীকরণে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকা Bretton Woods-এ অর্থনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করে বিশ্ব অর্থনীতির পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য। এই সম্মেলনের ফলে দুটি অর্থনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করা হয়—(১) World Bank এবং (২) International Monetary Fund। এই দুই সংগঠনের ওপরই আমেরিকা নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে। যেহেতু যুদ্ধের কোনো প্রভাব মার্কিন অর্থনীতিতে পড়েনি তাই এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে লগ্নিকৃত অর্থের সিংহভাগই প্রদান করেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই দুই সংগঠনের মুখ্য কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত ছিল এবং এখানে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি মার্কিন প্রতিনিধিগণ দখল করেছিল। দুটি সংগঠনের সংবিধানে সংগঠনগুলির পরিচালনার ব্যাপারে আমেরিকার প্রাধান্য স্বীকার করা হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে কোনো ব্যাপারে আমেরিকার ১/৩ অংশ ভোটদানের ক্ষমতা থাকবে।

World Bank প্রতিষ্ঠা লগ্নে বলা হয়েছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হবে বিশ্বযুদ্ধ বিধ্বস্ত পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির অর্থনৈতিক পুনর্গঠন। কিন্তু World Bank পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে শর্তসাপেক্ষে ঋণ মঞ্জুর করেছিল। বলা হয়েছিল যে সকল দেশ এই সংস্থার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাহায্য নেবে তাদের বিদেশি বিনিয়োগে ব্যবস্থা করতে হবে। এইভাবে সদস্য দেশগুলির অর্থনীতি উন্মুক্ত হয়েছিল বিদেশি শিল্পপতিদের কাছে। এই ব্যবস্থার সুবিধা শুধুমাত্র আমেরিকা নিতে পারত কারণ একমাত্র আমেরিকার কাছেই তখন উদ্বৃত্ত পুঁজি ছিল।

পশ্চিম ইউরোপের আমেরিকীকরণে International Monetary Fund-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আমেরিকা উপলব্ধি করেছিল যে অবাধ ও সম্প্রসারণশীল বাণিজ্যের মৌল উপাদান হল একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা। একটি স্থায়ী বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার জন্য গঠিত হয়েছিল International Monetary Fund।

World Bank এবং International Monetary Fund প্রথম দিকে আমেরিকার অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে সফল করতে পারলেও ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ এই দুটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে যুদ্ধোত্তর সহায়তা ও পুনরুজ্জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকা World Bank এবং International Monetary Fund-কে অগ্রাহ্য করে সরাসরি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে ঋণ দেয়। আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে কম সুদে ঋণ দেয়। এইভাবে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে। প্রথমত, তারা নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য আমেরিকার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, দ্বিতীয়ত এরা দীর্ঘমেয়াদি সুদ পরিশোধ (interest repayment)-এর জালে জড়িয়ে পড়ল। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিকে বাধ্য করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি স্বাক্ষর করতে। GATT চুক্তি (General Agreement on Tariff and Trade) অনুযায়ী ইউরোপীয় দেশ বিদেশি সামগ্রীর জন্য অত্যধিক হারে শুল্ক আহরণ করতে পারবে না বলা হয়। এই পদক্ষেপের ফলে মুনাফা হয়েছিল আমেরিকার। আমেরিকা অপর একটি নীতি "Marshall Plan" ঘোষণার মাধ্যমে পশ্চিম ইউরোপের আরো গভীরে প্রবেশ করে। মার্শাল পরিকল্পনার মাধ্যমে যে অর্থ মার্কিন কংগ্রেস আমেরিকাকে দান করে, তার শর্ত থাকে যে সেই অর্থের ৫০%

আমেরিকার মধ্যেই ব্যয় করতে হবে। এই অর্থ দিয়ে সেই সব সামগ্রী উৎপাদন করা হবে, যা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে রপ্তানি করা হবে।

১৯৫২ সালের মধ্যে আমেরিকার অর্থনৈতিক সাহায্য দানের ফলে ইউরোপের শিল্পজাত উৎপাদন প্রাক্-যুদ্ধস্তর থেকে ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং কৃষিজাত উৎপাদন ১০% বৃদ্ধি পেয়েছিল। অর্থনৈতিক নৈরাশ্য কাটিয়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং আমেরিকার বাণিজ্যিক মুনাফা ও চমকপ্রদ হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত মার্কিন অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন, পুর্ননির্মাণ এবং শেষ পর্যন্ত একটি স্থিতিশীল অবাধ বাণিজ্য নির্ভর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা আমেরিকার সমৃদ্ধি ও আধিপত্য নিয়ে এসেছিল। পশ্চিম ইউরোপ যে সামগ্রী আমদানি করত, তার ২/৩ অংশ নিত আমেরিকা থেকে যার ফলে যে সংস্থাগুলি রপ্তানি বাণিজ্য করত তাদের মুনাফা আরও দ্রুতহারে বৃদ্ধি পায়। ৫০ এবং ৬০-এর দশকে মার্কিন অর্থনীতির যে সম্প্রসারণ হয়েছিল তা সম্ভব হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে মার্কিন সামগ্রীর এত চাহিদার ফলে।

৯.৭ পুঁজিবাদী বিশ্বে সংকট

১৯৭০-এর দশক থেকেই পুঁজিবাদের সুদিনের অবসান হয় এবং শুরু হয় প্রবল সংকট। এই সংকটের একটি বৈশিষ্ট্যই হল অর্থনীতিতে অন্তর্নিহিতভাবে একটা অস্বাভাবিক বন্ধাত্ব এবং ভয়াবহ রকমের মুদ্রাস্ফীতি এবং পরিণতি হল কৃষিজ এবং শিল্প উৎপাদনের দারুন নিম্নগতি এবং একদিকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং অপরদিকে প্রচণ্ড রকমের বেকারি বৃদ্ধি। এর তীব্রতা এবং দীর্ঘস্থায়ীতার বিচারে এই মন্দা হয়ে দাঁড়ায় পুঁজিবাদের ইতিহাসে দীর্ঘতম এবং সর্বাপেক্ষ বিপজ্জনক।

৯.৮ পুঁজিবাদী সংকটের কারণ

অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের তাগিদে পরিকল্পনাবিহীন উৎপাদনের প্রতিযোগিতার ফলে বহু উৎপাদিত সামগ্রী উদ্বৃত্ত হয়। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি না ঘটলে উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রয় হয় না। এর সঙ্গে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে সমস্যা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ক্রেতার সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় উৎপাদিত সামগ্রীর একটি বড় অংশ গুদামজাত হয়, শুরু হয় অর্থনৈতিক মন্দা। শিল্পে ভয়াবহ সংকট দেখা দেয়।

৯.৯ পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের সূচনা

সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদ অন্য পথ গ্রহণ করে এবং সূচনা হয় পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের। এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ছিল ব্যাপকভাবে সরকারি ব্যয় সংকোচ, পাবলিক সেক্টরগুলিকে ভেঙে দিয়ে বেসরকারিকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিপ্লবের সুযোগ নিয়ে আধুনিক অটোমেটিক মেশিন ও কম্পিউটারের সাহায্যে অল্প সংখ্যক শ্রমিক দিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং তার দ্বারা মুনাফার হার কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা,

শ্রমিক কর্মচারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তাসূচক ব্যবস্থাগুলিকে হ্রাস করা, শ্রমিকদের প্রতিরোধের ক্ষমতাকে হ্রাস করার জন্য প্রচলিত শ্রম আইনের প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধন, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শুধু পুঁজি রপ্তানি নয়, ঐ সব দেশে কারখানা স্থাপন করে সস্তা মজুর ও সস্তা কাঁচামালের সুযোগ নিয়ে অল্প খরচে উৎপাদন ও মুনাফার মাত্রাকে অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করা এবং এজন্য বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা-কে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করা এবং এই সঙ্গে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম থেকে সরকারি হস্তক্ষেপ উঠিয়ে দিয়ে সেগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালনার ব্যবস্থা করা।

৯.১০ পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের পরিণাম

পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের মূল কথাই হল সরকারি শিল্পকে ভেঙে দিয়ে ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে আসা এবং সরকারি ব্যয় কমিয়ে দেওয়া। এই নীতির ফলে শুধু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নয়, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নয়া-উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্বে গরিব দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্মহীন হয়েছে। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যেকার ক্রমবর্দ্ধমান ফারাকের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগণের অমানবিক দারিদ্র বৃদ্ধি এবং ধনী মানুষদের অসীম প্রাচুর্য লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে মার্কসের *Capital* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বর্ণিত দারিদ্রায়নের তত্ত্বটির সঠিকতা প্রমাণ করে। মার্কসের *Capital* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলা হয়েছে, 'সামাজিক সম্পদ ও কার্যকরী মূলধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের সহযোগী বাহিনী ও বৃদ্ধি পায় আর তারই সঙ্গে বৃদ্ধি পায় সম্মিলিত উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা। শিল্প সহযোগী বাহিনী যত বৃদ্ধি পায় দারিদ্র তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে। এটাই হল পুঁজিবাদী পুঞ্জিভবনের সাধারণ সূত্র'।

৯.১১ উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দুই দশক নয়া ঔপনিবেশিক বিশ্ব ব্যবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রশ্নাতীত কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বে যে 'dollar shortage' দেখা দিয়েছিল, তার ফলেই পশ্চিম ইউরোপের আমেরিকীকরণ সম্ভব হয়েছিল। ৫০ এবং ৬০-এর দশকে মার্কিন অর্থনীতির সম্প্রসারণ ঘটে। তবে ১৯৭০-এর দশক থেকে পুঁজিবাদের সংকটের সূচনা হয়। সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব পুঁজিবাদ অন্য পথ গ্রহণ করে এবং সূচনা হয় পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের। তবে পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের ফলে শুধু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি নয়, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কর্মচারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে নয়া উদারনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্বে গরিব দেশের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৯.১২ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। উন্নয়নের সংজ্ঞা দিন।

২। উন্নত এবং অনুন্নত দেশগুলি কী নামে পরিচিত? এর ব্যাখ্যা দিন।

৩। উন্নয়নের আনুষঙ্গিক সমস্যা বর্ণনা করুন।

৪। কীভাবে পশ্চিম ইউরোপে আমেরিকীকরণ সম্ভব হয়েছিল?

৫। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের সূচনা কীভাবে হয়েছিল। এর পরিণাম কী হয়েছিল?

৯.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক,* কলকাতা, ২০০৯।

২। মুরারি ঘোষ—*বিশ্বায়ন, ডলার ও বিকল্প বিশ্বের সন্ধানে,* কলকাতা, ২০০৫।

৩। অমিয় কুমার বাগচী ও অন্যান্য—*বিশ্বায়ন, ভাবনা-দুর্ভাবনা, ১ম ও ২য় খণ্ড,* কলকাতা, ২০১২।

৪। W. M. Spellman—*A Concise History of the World Since 1945, States and People's*, Red Globe Press, 2020।

একক-১০ ❑ বিশ্বায়ন : প্রেক্ষাপট, বৈশিষ্ট্য এবং তৃতীয় বিশ্বের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

- বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাণিজ্যপুঁজি এবং তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে একসূত্রে বেঁধেছে।
- ধনতন্ত্রের দ্বারা বিশ্ব অর্থনীতিকে এক মেরুতে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বায়িত অর্থনীতির উদ্ভব।
- আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক লেনদেন প্রক্রিয়ার দ্রুত বিকাশ, বাণিজ্যের অগ্রগতি, বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপকতা, প্রযুক্তিগত উন্নতি হল বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য।
- বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি বিপদগ্রস্ত, বিশ্বায়ন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই বিশ্বায়ন হল পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে কার্যকর।

১০.১ ভূমিকা

বিশ্বায়ন পুঁজিবাদের এক বিশেষ রূপ। ধনতন্ত্রের দ্বারা বিশ্ব অর্থনীতিকে এক মেরুতে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বায়িত অর্থনীতির উদ্ভব। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত একমেরুকরণের বিশ্বে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শক্তির অভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে একমুখী ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হয়নি। বিশ্বায়নের প্রভাবে অর্থনৈতিক বিকাশের অভাবের ফলে তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি বিপদগ্রস্ত।

১০.২ বিশ্বায়ন : সংজ্ঞা

'বিশ্ব' শব্দটি বহু প্রাচীন হলেও এর থেকে উদ্ভূত 'বিশ্বায়ন' বা 'বিশ্বীকরণ' ইতাদি ধারণাগুলির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। এই শব্দগুলির তাৎপর্য শিক্ষা জগতে স্বীকৃত হয় আট দশকের সময় থেকে। অধ্যাপক রোল্যান্ড রবার্টসন 'বিশ্বায়ন ধারণাটির প্রবর্তক। তিনি সমাজ বিজ্ঞানের আধুনিকীকরণের আলোচনাকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। রবার্টসনের মতে একটি ধারণা হিসাবে বিশ্বায়ন একদিকে যেমন বিশ্বের সংকুচীকরণ বোঝায় অপরদিকে বিশ্বের একত্বীকরণের ধারণা ও সৃজন করে। বিশ্বায়ন, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বাণিজ্য, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান নির্ভরশীলতার প্রতি আলোকপাত করে। বিশ্বায়ন ধারণাটির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল 'এক বিশ্ব' এই ধারণার সৃজন। অমিয় কুমার বাগচী বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বায়ন হল একটি জগৎব্যাপী প্রক্রিয়া'। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া বাণিজ্যপুঁজি এবং তথ্য-প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটিয়ে বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রকে একসূত্রে বেঁধেছে এবং এক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতাও বাড়িয়ে তুলেছে। বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সীমানা এবং জাতীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ করেছে। বিশ্বায়নের একটি সদর্থক দিক হল বাজার ও সংস্কৃতিকে সমসাময়িক ভূ-রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে, জাতীয় সত্তা বা সংস্কৃতির গুরুত্ব আগ্রহ্য করে আমাদের বিশ্ব-নাগরিক হিসাবে ভাবতে সাহায্য করে।

১০.৩ বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপট

বিশ্বায়ন পুঁজিবাদেরই এক বিশেষ রূপ। ধনতন্ত্রের দ্বারা বিশ্ব অর্থনীতিকে এক মেরুতে বেঁধে রাখার ব্যবস্থা হিসাবে বিশ্বায়িত অর্থনীতির উদ্ভব। বিশ্ব অর্থনৈতিক জগতের চেহারা ছিল তিনভাগে বিভক্ত। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি, ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও প্রাক্-আধুনিক অনুন্নত পর্যায়ের বিচিত্র অর্থনীতি। এই তিন ধরনের আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনো একক যোগসূত্র ছিল না। প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন ঔপনিবেশগুলি নিয়ে পৃথক জগৎ তৈরি করে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার অবসানের পর বিশ্ব অর্থনীতির নতুন পর্যায় শুরু হয়।

বিশ্বায়ন ব্যবস্থার সূচনায় স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি পরবর্তীকালে যারা অনুন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত তাদের অনেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা চালু রেখে বিদেশি পুঁজির অবাধ অভিযান ও

পুঁজি চলাচলে বাধার প্রাচীর গড়ে তুলে রাষ্ট্রীয় লগ্নী উদ্যোগে শিল্পায়ন সৃষ্টিতে মগ্ন ছিল। অবাধ বাণিজ্য ব্যবস্থাতে সাড়া দেয়নি। বৈদেশিক আমদানি সীমাবদ্ধ রেখে দেশজ পণ্য উৎপাদনে ও তার ব্যবহার দেশজ বাজার তৈরিতে ব্যস্ত ছিল। এ ক্ষেত্রে তারা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সহায়তা লাভ করত। সোভিয়েত প্রযুক্তি সহায়তা ও পুঁজি সহায়তায় জাতীয় উন্নয়নে বেশ কয়েকটি অনুন্নত রাষ্ট্র কিছু পরিমাণে লাভবান হয়েছিল। ফলে ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের একমুখীনতা সমসাময়িক পরিস্থিতিতে, বিশেষত ১৯৯০-এর আগে পর্যন্ত সেভাবে সম্ভব ছিল না। বিশ্ব অর্থনীতি দুই মেরুতে আকৃষ্ট ছিল। নব্বই-এর দশকের গোড়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই পরিস্থিতি আর বজায় ছিল না।

১৯৯১ খ্রিস্টাব্দের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভাবিত একমেরুকরণের বিশ্বে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক শক্তির অভাবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পক্ষে একমুখী ধনতান্ত্রিক বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হল না। বিশ্বায়ন ব্যবস্থার চাপে বিশ্বপুঁজি বা উন্নত দেশের বহুজাতিক সংস্থাগুলির আগমনে যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম শুরু হল তার লক্ষ্য ছিল বিশ্ব অর্থনীতিকে বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে রাখা। বিশ্ব বাজারকে আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা ও বিশেষভাবে লগ্নিকৃত দেশের বাজারের উন্নয়ন সীমিত রাখা। বিশ্বায়নের শুরুতে লগ্নিকারী দেশগুলির লক্ষ্য পথে ছিল অনুন্নত দেশের সুলভ কাঁচামাল ও স্বল্প মজুরীতে প্রাপ্ত শ্রমশক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বিশেষত উচ্চ আয়ের মানুষের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটানো।

বিশ্বায়ন হল কতকগুলি নির্দিষ্ট আর্থিক নীতির সমাহার, যে নীতিগুলি গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসার, বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে লোকজনের অভিগমন ও নির্গমন, বিভিন্ন দেশের মধ্যে অর্থসহ অন্যান্য বিনিময় মাধ্যমের সঞ্চালন, একদেশের মূলধন অন্য দেশে বিনিয়োগ করে সেখানে শিল্পদ্রব্য, কৃষিজ পণ্য অথবা পরিষেবা-পণ্য উৎপাদন করে সেদেশে অথবা অন্য দেশে বিক্রয়ের প্রবাহ, বহুজাতিক অথবা অতিজাতিক বাণিজ্য সংস্থার (Multinational) বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উপর প্রভাব, বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রযুক্তির আদানপ্রদান প্রভৃতি। বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার (International Monetary Fund), বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা, বিশ্বব্যাংক থেকে শুরু করে অধিকাংশ ধনী এবং দরিদ্র দেশের অর্থমন্ত্রক বিশ্বায়নমুখী নীতির প্রবল সমর্থকে পরিণত হয়েছে।

১০.৪ বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য

বিশ্বায়নের সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির যোগ থাকলেও এর সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত আছে অর্থনৈতিক সম্পর্ক। বিশ্বব্যাপী পুঁজি ও বাজারের কেন্দ্রীকরণ আর্থিক বিশ্বায়নের মূলকথা যা জাতীয় বাজার বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর দেশগুলি একে অপরের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তবে এই ধরনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতা নতুন ঘটনা নয় বা পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়াও অভিনব কিছু নয়। পুঁজিবাদের সূচনা থেকে মুনাফার খোঁজে পুঁজির বিশ্বব্যাপী পরিক্রমার প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো* রচনা করে বিশ্লেষণ করে দেখান যে পুঁজি মুনাফার খোঁজে পৃথিবীর

সর্বত্র বাসা বাঁধার চেষ্টা করে এবং পুঁজির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য পুঁজিপতিরা যান্ত্রিক ও কারিগরি উন্নতি সাধনের চেষ্টা করে। পুঁজির প্রাথমিক যুগে বিশ্বায়ন ছিল পুঁজিবাদ ও মুনাফা বৃদ্ধির প্রেরণা সঞ্চারের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তখন পুঁজিবাদের কোনো সংকট উপস্থিত হয়নি। সেটি ছিল পুঁজিবাদের ক্রমবিকাশের যুগ।

সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় চারটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ক) আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রক্রিয়ার দ্রুত বিকাশ।

খ) বাণিজ্যের দ্রুত অগ্রগতি।

গ) সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপকতা, বিশেষ করে বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলির দ্বারা।

ঘ) বিশ্বব্যাপী যাতায়াত, যোগাযোগের এবং ভাবধারা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ণ প্রযুক্তিগত উন্নতি ও দ্রুততার সৃষ্টি।

১০.৪.১ লগ্নির বিশ্বায়ন

বস্তুতপক্ষে লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়নই বিশ্ব পুঁজিবাদের মূল সাফল্য। সাম্প্রতিককালে লগ্নিপুঁজির এই ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, টোকিও-র মুদ্রা ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে যেখানে ১৮,৮০০ কোটি ডলারের লেনদেন হয়েছিল সেখানে ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে সেই লেনদেনের পরিমাণ হয় ১,০০,২০০ কোটি ডলার। বিদেশি মুদ্রার এই লেনদেন মূলত আন্তর্জাতিক বাজারের ফলশ্রুতি কারণ বিদেশি দ্রব্য বা পরিষেবার ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে লেনদেন সংঘটিত হয় কোনো বিদেশি মুদ্রার মাধ্যমে।

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মুদ্রা বিনিময়ের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মুদ্রা বাণিজ্য ছাড়াও বন্ড, মিউচ্যুয়াল ফান্ড, ঋণপত্র ইত্যাদির মধ্যে দিয়েও এই লগ্নিপুঁজির আবির্ভাব ঘটে এবং লগ্নিপুঁজি বিশ্বায়নকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে।

১০.৪.২ বাণিজ্যের অগ্রগতি

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার অন্যতম চালিকা শক্তি হল বাণিজ্য। জাতীয় বাণিজ্যকে বিশ্ব বাণিজ্যের স্তরে উন্নয়নের পেছনে কাজ করে চলেছে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের সম্মিলিত প্রয়াস বিশেষ করে শুল্ক হ্রাসের প্রক্রিয়া ও অবাধ বাণিজ্যের গতি। বিশ্ব বাণিজ্যের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংগঠন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হওয়ার আগে পাশ্চাত্যের মিত্র জোট যুদ্ধোত্তরকালে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করে। এর ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা (International Monetary Fund) বা IMF সৃষ্টি হয়। বিংশ শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশ IMF-এ যোগদান করেছে।

IMF-এর মূলধনের যোগান এসেছিল মূলত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের থেকে যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন সবচেয়ে বেশি। স্বাভাবিকভাবে IMF-এর টাকা খরচ করার প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশি। IMF বিভিন্ন দেশের বিশেষ করে গরিব রাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য ঋণ দান করে। বিনিময়ে ঋণ গ্রহীতা দেশসমূহ IMF-এর ঋণ গ্রহণ শর্ত মানতে বাধ্য থাকে।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে World Bank বা বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয়। এই অর্থনৈতিক সংস্থাটি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তার কার্যাবলী শুরু করে। এর কাজ হল কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে গৃহীত কোনো প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান। এর কার্যকরী মূলধন আসে মূলত সদস্য রাষ্ট্রসমূহের চাঁদা থেকে। IMF এবং World Bank এই দুই সংস্থাই বিশ্বায়নের গতি বাড়িয়েছে। বিশ্বব্যাংক প্রথম দিকে ইউরোপের যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশগুলিকে অর্থ ধার দিত। IMF-এর কাজ ছিল বিভিন্ন দেশের টাকার বিনিময় হারকে এক জায়গায় ধরে রাখা। এছাড়া কোনো দেশের আন্তর্জাতিক লেনদেনের অসমতা ও বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দিলে তা মোকাবিলা করার জন্য IMF টাকা ঋণ দিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আন্তর্জাতিক স্তরে IMF, বিশ্বব্যাংক-এর সম্মিলিত প্রয়াসে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয় General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)। শুল্ক হ্রাসের ক্ষেত্রে GATT ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। শুল্ক হ্রাস ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে GATT-এর ভূমিকা অপরিসীম।

GATT মূলত গৃহীত হয়েছিল সমসাময়িক বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে। GATT প্রায় পঞ্চাশ বছর টিকে ছিল। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে GATT তার অস্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটিয়ে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে World Trade Organization (WTO) বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হিসাবে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে GATT-এর মাধ্যমে যে বহুপাক্ষিক চুক্তিগুলি অনুষ্ঠিত হয় তা পরে WTO-এর মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

১০.৪.৩ বিদেশি বিনিয়োগের ব্যাপকতা (বহুজাতিক সংস্থার দ্বারা)

বিশ্বায়নের সঙ্গে বহুজাতিক সংস্থার গভীর সম্পর্ক আছে। জন স্পানিয়ারের মতে বহুজাতিক সংস্থা বা ব্যবসায়ী উদ্যোগ বলতে সেইসব সংস্থাকে বোঝায় যারা বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশ করে। তারা আন্তর্জাতিক কেনা বেচার ক্ষেত্র গড়ে তোলে। জি. এম. গিলগিন বলেছেন, বহুজাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশে অর্থ লগ্নী করে। বিশাল অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করে শিল্প স্থাপন, পরিষেবামূলক পণ্য উৎপাদন, কৃষি খনিজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

বহুজাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হল খুব কম ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করে বিশ্বের বাজারকে নিয়ন্ত্রণে আনা। ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী বহুজাতিক সংস্থা পণ্য উৎপাদন করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্য বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। এই সংস্থাগুলি দক্ষ প্রশাসন, আর্থিক, সমৃদ্ধি, উন্নত প্রযুক্তি, কৌশল ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে তাদের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছে। এই সব সংস্থার মধ্যে অন্যতম হল ইউনিলিভার, I.B.M.,

জেনারেল মোটরস্, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি। এই সংস্থাগুলি বিপুল সম্পদ নিয়ে নিজেদের স্বার্থে বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলেছে।

১০.৪.৪ প্রযুক্তির বিকাশ ও অগ্রগতি

বিশ্বায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রযুক্তির বিকাশ ও অগ্রগতি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে Microchip আবিষ্কারের ফলে বিশ্বায়নের একটি দিক উন্মোচত হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে শকলি, ব্রাটেন ও বার্ডিন নামে তিনজন মার্কিন বিজ্ঞানী Semiconductor আবিষ্কার করেন। এটি ছিল সাধারণ সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, তামা দিয়ে তৈরি একটি যৌগ পদার্থ। এই যৌগের resistance শক্তি কম হওয়ায় এর ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি চালানো যায় এবং তার ফলে অনেক ধরনের কাজ—বিশেষ করে যে সব কাজে আলো, শব্দ ইত্যাদি নানা ধরনের তরঙ্গ প্রবাহ প্রয়োজন হয়। এর পরে দূরদর্শন আবিষ্কার হলে বিশ্বায়নের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কম্পিউটার আবিষ্কার হওয়ার পর বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির বিশ্বজয় হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিপ্লবের ফলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক ব্যবধান অনেক কমে গিয়েছে। বিশ্বের কোনো ঘটনা বা আবিষ্কার দ্রুত বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্বায়নের জন্য রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্রিয়াকলাপ আন্তর্জাতিক চরিত্র ধারণ করেছে। বিশ্বায়ন বদলে দিতে পেরেছে গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের সংজ্ঞা বা ধারণা।

১০.৫ তৃতীয় বিশ্ব বিশেষত ভারতের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব

১০.৫.১ তৃতীয় বিশ্ব

বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি বিপদগ্রস্ত। অর্থনৈতিক, সামাজিক বৈষম্য বর্তমানে স্থায়ী বিষয়ে পরিণত। নিরক্ষরতা, দারিদ্রতা, বেকারত্ব তাদের নিত্যসঙ্গী। স্বাস্থ্য পরিষেবার অভাব, বাসস্থানের অভাব, পানীয় জলের সংকট বেড়েছে। এই সব সমস্যার মূল কারণ হল অর্থনৈতিক বিকাশের অবনতি। আর্থিক অনগ্রসরতা, উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সীমাবদ্ধতা তৃতীয় বিশ্বের বৈশিষ্ট্যে পরিণত।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব না থাকলেও সেগুলিকে শিল্পে কাজে লাগানোর জন্য যে পুঁজি ও কৃৎকৌশলের প্রয়োজন তার অভাব আছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি বিশ্বব্যাংক, WTO প্রভৃতি থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক সংস্থা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে যেভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তার ফলে দেশগুলির রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে, GATT চুক্তির মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে নিয়ন্ত্রণে এনে পুঁজিবাদী দুনিয়া মুনাফা লাভের চক্রান্ত করেছে। উন্নত দেশগুলি উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা ও পরিকাঠামোর সাহায্যে সস্তায় পণ্য উৎপাদন করে সেগুলিকে তৃতীয় বিশ্বের বাজারে বিক্রি করছে।

বিশ্বায়ন বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এই বিশ্বায়ন হল পুঁজিবাদের বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে কার্যকর।

১০.৫.২ ভারত

১৯৮০-র দশকের গোড়ায় রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং ডক্টর মনমোহন সিং-এর অর্থমন্ত্রীত্বের সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্লেষণ করে ভবতোষ দত্ত লিখেছেন : ১৯৮১ থেকে যে দশকের সূচনা হল, তার মতো সংকটের দশবছর স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে আগে কখনও আসেনি। নিরন্তর মূল্যবৃদ্ধি, কালো টাকার প্রসার, আন্তর্জাতিক লেনদেন ঘাটতি, টাকার বহির্মূল্যে অস্থিরতা, বিদেশ থেকে প্রচুর ঋণের ব্যবস্থা ইত্যাদি সমস্যা প্রত্যেকটি অন্যগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা ও বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে কাঠামোগত শর্ত মেনে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিয়েছিল। ঋণ গ্রহণকারী দেশগুলির বাজার উন্মুক্ত করা, বহুজাতিক পুঁজির অবাধ যাতায়াতের পথ মসৃণ করা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা ইত্যাদি ছিল এরূপ সংস্কারের অংশ। বিশ্ব বাজারের কাছে ভারতের অর্থনীতিকে মুক্ত করে দেওয়ার ফলে ১৯৯০-৯১ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল প্রায় ৬০০ কোটি ডলার।

১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে বিশ্বায়নের প্রভাবে যে আর্থিক সংস্কার শুরু হয়েছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

(ক) আণবিক ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া আর সব উৎপাদনেই বিদেশি পুঁজির অবাধ অধিকার।

(খ) বৃহৎ ভোগ্যপণ্য শিল্পে লাইসেন্স প্রথার অবসান,

(গ) বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে তাদের পণ্য বিক্রির অনুমতি প্রদান,

(ঘ) উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশজ কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের বাধ্যবাধকতার বিলুপ্তি এবং

(ঙ) বিদেশি সংস্থার ভারতের উৎপাদনে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি অংশীদারত্বের অনুমতি।

এই সংস্কারের ফলে বাটা, কোডাক, ফিলিপস্, কোলগেট ইত্যাদি উৎপাদন সংস্থার হাতে ৫০ শতাংশের বেশি শেয়ার চলে গেছে। সেই সঙ্গে শুরু হয়েছে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ।

এর ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে ধনী দরিদ্রের বৈষম্য। UNDP থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০১ খ্রিস্টাব্দে ভারতে মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪৬২ ডলার। ঐ সময়ে পৃথিবীর সব দেশ মিলিয়ে গড় মাথাপিছু উৎপাদন ছিল ৫১৩৩ ডলার। অর্থাৎ গড় মাথাপিছু উৎপাদনের তুলনায় ভারতের মাথাপিছু উৎপাদন ছিল দশ শতাংশের কম।

বিশ্বায়ন পণ্যনির্ভর ও শিল্পমুখী হওয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়েছে। বেড়েছে রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের উৎপাদন, ফলে বিপদে পড়েছে প্রান্তিক কৃষক সমাজ। অর্থনৈতিক সংস্কার চালু হওয়ার পর ভারতে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠার চেয়ে মধ্যস্বত্বভোগী শিল্প পণ্য সংস্থা গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে

আসল শিল্প বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমতে শুরু করেছে। শিল্প বৃদ্ধির একটি অন্যতম সূচক হল পুঁজিলগ্নির পরিমাণ। ২০০২-০৩ খ্রিস্টাব্দে দীর্ঘমেয়াদি লগ্নির পরিমাণ ভারতে ১৯৯৬-৯৭-এর তুলনায় অর্দ্ধেক হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে কাজের সুযোগ কমেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা আরও শোচনীয়। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ-এর হিসাবে দেখা গেছে ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের মধ্যে সক্ষম শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৬ কোটি ২০ লক্ষ, এদের মধ্যে কাজ পায়নি ৩২ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ।

সমালোচকরা বলেন বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির পরিকাঠামো ও গণমাধ্যমের উপর বহুজাতিক সংস্থাগুলির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিমি ভোগবাদী সংস্কৃতি ভারতের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে। অমিয় কুমার বাগচী বলেছেন, ভারতে স্বদেশি ও বিদেশি প্রযুক্তি দিয়ে তৈরি বিলাসদ্রব্য সাধারণের আয়ত্বের বাইরে থেকে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের ফলে ভারতের আদিবাসীদের জীবনযাত্রা করুণ হয়েছে। নতুন ব্যবস্থার বেসরকারিকরণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তি মালিকানায় যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা ও অফিস চালু হচ্ছে, সেখানে দলিত বা তফশিলি জাতিভুক্তদের জন্য কোনো সংরক্ষণের বাধ্যবাধকতা নেই। হাজার হাজার আদিবাসী পরিবার অনাহারে দিন অতিবাহিত করছে। খাদ্য নিরাপত্তা ভেঙে পড়েছে। এর প্রমাণ মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা ও রাজস্থানে অনাহারজনিত মৃত্যুর ঘটনা।

১০.৬ উপসংহার

বিশ্বায়নের সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতির যোগ থাকলেও এর সঙ্গে গভীরভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক যুক্ত আছে। বিশ্বব্যাপী পুঁজি ও বাজারের কেন্দ্রীকরণ আর্থিক বিশ্বায়নের মূলকথা যা জাতীয় বাজার বা রাষ্ট্রের পরিবর্তে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ার ফলে পৃথিবীর দেশগুলি একে অপরের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বায়নের প্রভাবে সমগ্র তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের অবনতির কারণে বিপদগ্রস্ত। ভবতোষ দত্ত লিখেছেন—১৯৮১ থেকে যে দশকের সূচনা হল, তার মতো সংকটের দশবছর স্বাধীন ভারতে ইতিহাসে পূর্বে কখনও আসেনি। অর্থনৈতিক সংকট ছাড়া ও তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হয়ে পড়েছে। উন্নত তথ্য-প্রযুক্তির পরিকাঠামো ও গণমাধ্যমের উপর বহুজাতিক সংস্থাগুলির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে পশ্চিমি ভোগবাদী সংস্কৃতি ভারতের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে ম্লান করে দিয়েছে।

১০.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। বিশ্বায়নের সংজ্ঞা দিন। বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপট আলোচনা করুন।

২। বিংশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। তৃতীয় বিশ্ব বিশেষত ভারতের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।

১০.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১। অমিয় কুমার বাগচী ও অন্যান্য—*বিশ্বায়ন : ভাবনা দুর্ভাবনা, ১ম ও ২য় খণ্ড*, কলকাতা, ২০১২।

২। রতন খাসনবিশ—*বিশ্বায়ন ও ভারতবর্ষ, অর্থনীতির ইডিওলজি*, কলকাতা, ২০০৫।

৩। J. D. Schmidt and Hersh (eds.) 2000, *Globalisation and Social Change*, London।

৪। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব, ১৮৭০-২০০৬*, কলকাতা, ২০০৭।

৫। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

একক-১১ ❑ বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক সংস্থা, তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- বহুজাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হল খুব অল্প ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করে বিশ্বের বাজারকে নিয়ন্ত্রণে আনা।
- সীমান্তবিহীন বিশ্ব নির্মাণের কাজে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হল তথ্য বিনিময়ের অভূতপূর্ণ প্রযুক্তিগত উন্নয়ন।
- অর্থনীতি ছাড়াও কূটনীতি এমনকি সমরকৌশল ও অতি সহজে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দ্রুতগামী যোগাযোগের মাধ্যমে।
- বিশ্বায়নের যুগে মানুষের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিরাপত্তা নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছে।

১১.১ ভূমিকা

বহুজাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশ করে এবং আন্তর্জাতিক কেনা-বেচার কেন্দ্র গড়ে তোলে। বহুজাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হল খুব অল্প ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করে বিশ্বের বাজারকে নিয়ন্ত্রণে আনা। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মূলধন ও কারিগরি প্রযুক্তির অভাব থাকায় আবার প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলি এই দেশগুলির উপর তাদের প্রভূত্ব কায়েম করেছে। বিক্রেতা বা উৎপাদকের সঙ্গে ক্রেতার দ্রুত যোগাযোগ তৈরি হওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ

বাহন হিসাবে কাজ করছে। বিশ্বব্যাপী এই বিরাট বাজার ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়ত যদি না যোগাযোগ ব্যবস্থা তার সহায়ক হিসাবে দেখা দিত। অর্থনীতি ছাড়াও কূটনীতি এমনকি সমর কৌশলও অতি সহজে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দ্রুতগামী যোগাযোগের মাধ্যমে।

১১.২ বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক সংস্থা

বহুজাতিক সংস্থা বা Multi-national Corporations-এর ব্যাখা দিয়ে জন স্পনিয়ার *The Games Nations Play* গ্রন্থে বলেছেন : বহুজাতিক সংস্থা বা ব্যবসায়ী-উদ্যোগ বলতে সেই সব সংস্থাকে বোঝায় যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বা বিভিন্ন দেশের সীমানা অতিক্রম করে বিভিন্ন দেশের বাজারে প্রবেশ করে এবং আন্তর্জাতিক কেনা-বেচার কেন্দ্র গড়ে তোলে। বিদেশে অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করে শিল্প স্থাপন, পরিষেবামূলক পণ্য উৎপাদন, কৃষি-খনিজ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করে। বহুজাতিক সংস্থার উদ্দেশ্য হল খুব অল্প ব্যয়ে পণ্য উৎপাদন করে বিশ্বের বাজারকে নিয়ন্ত্রণে আনা। ক্রেতার পছন্দ অনুযায়ী বহুজাতিক সংস্থা পণ্য উৎপাদন করে। বাজার দখল করার জন্য তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যের বিজ্ঞাপন বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দেয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাফল্য বহুজাতিক সংস্থাগুলির স্বপ্নপূরণের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

বহুজাতিক সংস্থা বেশ কয়েকটি সংস্থা নিয়ে কর্পোরেশন গঠন করেছে। বহুজাতিক সংস্থার সদর দপ্তর কোনো একটি দেশে থাকে। দক্ষ প্রশাসন, আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নত প্রযুক্তি, কৌশল ক্রেতাকে আকৃষ্ট করে বহুজাতিক সংস্থাগুলি তাদের মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রকে প্রস্তুত করেছে। বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করলেও তাদের কাজের সীমা শুধুমাত্র আর্থিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। তাদের আর্থিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও তারা নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে। বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি উন্নয়নশীল দেশের শিল্প, বাণিজ্য পরিষেবা তাদের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। পুঁজির বিনিয়োগ করেছে এবং প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এক্ষেত্রে তাদের সহায়তা করেছে। মার্কিন বহুজাতিক সংস্থাগুলি যে পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করেছে তার সঙ্গে কোনো সংস্থা পাল্লা দিতে পারেনি। মার্কিনী সংস্থাগুলির পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হল তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মূলধন ও কারিগরি প্রযুক্তির অভাব থাকায়, আবার প্রাকৃতিক সম্পদের কোনো অভাব না থাকার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন সংস্থাগুলি এই দেশগুলির উপর তাদের প্রভুত্ব কায়েম করেছে।

বহুজাতিক সংস্থাগুলি বেশ কয়েকটি বৃহৎ কর্পোরেশনের অধীনে রয়েছে। এই কর্পোরেশনগুলি আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ইংল্যান্ড, জাপান ও ফ্রান্সের অধীন। বিশ্বের সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকটি দেশের অধীনে এসেছে। গ্যাট চুক্তি, আর্থিক উদারীকরণ, বিদেশি পুঁজির অবাধ প্রবেশ, শিল্প, ব্যাংক, ব্যবসা, কৃষির উপর নিয়ন্ত্রণের ফলে তৃতীয় বিশ্ব ক্রমশই নিঃশেষিত হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের মানুষ নির্মমভাবে শোষণের শিকার। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি তাদের আর্থিক সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারেনি। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, বাসস্থানের সংকট, বেকারত্ব এ সবই বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক সংস্থার শোষণের পরিণতি।

বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে দেশীয় বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতে যে আর্থিক সংস্কার শুরু হয়েছিল তাতে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে তাদের পণ্য বিক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এই সংস্থাগুলিকে অবাধ শোষণের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এদেরকে নিজেদের স্বার্থে পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের অধিকার দেওয়া হয়েছে। বিদেশি সংস্থাগুলি ভারতের উৎপাদনের ৫০ শতাংশের বেশি অংশীদারত্বের সুযোগ পেয়েছে।

শুধু বাণিজ্যই এর শেষ নয়। সংস্কৃতির ওপরেও এদের প্রভাব গভীর। ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও তাদের প্রভাবে কলুষিত হয়েছে। অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরা নিজেদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে ভুলে পুঁজিবাদী দেশগুলির সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে আধুনিক হওয়ার এক ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। একধরণীকরণ (Uniformity), আত্তীকরণ (Appropriation) আর বিনির্মাণ (Deconstruction)—এই তিন বৈশিষ্ট্য দিয়ে বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রিত জগতের সংস্কৃতির উপর প্রভাবকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এক ধরণীকরণের দিকচিহ্ন হল দুটি—একদিকে বাজার দেশের লোকসাংস্কৃতিক বৈচিত্রকে ধ্বংস করে একরকমের সমাজমনস্কতা তৈরি করা হয়, যাতে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে একই ধরনের পণ্যের চাহিদা, তাতে সুবিধা হয় পণ্য উৎপাদক দেশের বা বহুজাতিক কোম্পানির। অন্যদিকে ধনতন্ত্রমুখী সাংস্কৃতিক স্রোতটা বয়ে চলে পশ্চিম থেকে পূর্বে, পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে বা উন্নত জগৎ থেকে অনুন্নত বিকাশমান জগতে। সমাজ সহজেই এটি মেনে নেয় কারণ পণ্যভিত্তিক আধুনিকতার মোহ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

কিন্তু কিছু সামাজিক প্রবণতা থেকে যায়, যেগুলিকে এই একধরণীকরণের প্রক্রিয়ার ভেতরে আনা যায় না। বিশ্বায়নের উৎপাদন ব্যবস্থা সেই প্রবণতাকে জুড়ে নেয় নিজের সঙ্গে। এইভাবেই বহুজাতিক উৎপাদক সংস্থাগুলি ভারতে আর্য়ুবেদকে ব্যবহার করে, অথবা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যোগশাস্ত্রকে আধুনিক পণ্যের মোড়কে বিক্রয় করে। এমনকি হিন্দুত্বকে পণ্য করে পুঁজি বাড়িয়ে নেয় বিশ্বায়িত চলচ্চিত্র শিল্প। একে বলা হয় আত্তিকরণ।

তৃতীয় প্রভাবটি অর্থাৎ সাংস্কৃতিক বিনির্মাণ সবচেয়ে বেশি ধ্বংসাত্মক। সামাজিক মূল্যবোধের স্থায়িত্ব বিশ্বায়ন সহ্য করে না। কারণ সেই মূল্যবোধ একরূপী পণ্য কাঠামোর সঙ্গে খাপ খায় না। আগে যে অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর পরিবার দাঁড়িয়ে ছিল সেটি পরিবারিক শ্রম ও শ্রমবিভাজনের পরিবর্তনের ফলে নষ্ট হয়ে গেলেও ধনতন্ত্রায়ন তার কাঠামোকে সম্পূর্ণ ভাঙতে পারেনি। বিশ্বায়ন সেই ভাঙনকে সম্পূর্ণ করে। গড়ে তোলে পণ্যভোগী অচেতন অথবা মোহাচ্ছন্ন ব্যক্তিসত্তা।

১১.৩ তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লব

বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাহন হল তথ্য বিনিময়ের অভূতপূর্ব প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। আধুনিক প্রযুক্তির নানা আবিষ্কার মানুষে মানুষে ও সমাজের সঙ্গে সমাজের নৈকট্য রচনা করে চলেছে। সর্বাধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে সংবাদ সরবরাহ, তথ্যের আদান প্রদান, আলাপচারিতা চলছে প্রতিনিয়ত, মুহূর্তের মধ্যে। সীমান্তবিহীন বিশ্ব নির্মাণের কাজ এভাবেই এগিয়ে চলেছে। ব্যক্তিমানুষ, জাতিভিত্তিক

সমাজ এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার মধ্যে সংযোগ এখন সহজ এবং স্বাভাবিক ঘটনা।

বিশ্বায়ন গতি পেয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির (Information Technology) হাত ধরে New International Information Order-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তথ্যপ্রযুক্তির মূল্যায়ন তিনদিক থেকে করা যায়—

(ক) তথ্যসঞ্চায়ন, তথ্য সঞ্চালন ও তথ্য বাজারের সংরক্ষণ ও প্রসারণ,

(খ) তথ্যের পণ্যায়ন এবং

(গ) উদ্বৃত্ত মূল্যজনক প্রযুক্তি

১৯৮০-র দশক থেকে উন্নত বিশ্বের অর্থনৈতিক এজেন্টগুলি স্যাটেলাইট-কম্পিউটরভিত্তি তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা (Computer Synthesized Satelite Receiver) চালু করেছে। এর ফলে গোটা বিশ্বের সম্পদ, চাহিদা, জনসংখ্যা, সাচ্ছল্য বা দারিদ্র, সমাজের ক্রয়ক্ষমতা, আঞ্চলিক সৃজনশীলতা প্রভৃতি তথ্য দ্রুত বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে যায়। ডিজিটাল আর্কাইভ ব্যবস্থায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায়, সময়মতো কাজে লাগানো যায় এবং বেশি দামে বিক্রি করা যায়। সাধারণ অবস্থায় এই তথ্যবাজারের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ প্রযুক্তি হল ইন্টারনেট এবং ইন্ট্রানেট। এর মাধ্যমে পৃথিবীর ভোক্তারা আজ আর কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের 'সিটিজেন' বা নাগরিক নন, তারা সকলেই হয়ে পড়েন 'নেটিজেন' বা ইন্টারনেট নাগরিক।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয় ক্রেতা, তৈরি হয় তার চাহিদা এবং তার যোগাযোগ হয় বিক্রেতা বা উৎপাদকের সঙ্গে। ডক্টর মনমোহন সিং ১৯৯০-এর দশকে স্যাটেলাইট সম্প্রচারে ছাড়পত্র দিয়ে ভারতে এই ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, প্রসাধন বা শারীরচর্চা সবই ঠিক করে দেয় এই স্যাটেলাইট পণ্যায়ন।

তথ্য সংগ্রহ আর উৎপাদনমুখী ব্যবহারের নানা কৌশল উদ্ভাবন করে উদ্বৃত্ত মূল্য ও সৃষ্টি করতে পারে তথ্যপ্রযুক্তি। সারা বিশ্বে যে নেটভিত্তিক বাণিজ্য চলে যেমন ই-কর্মাস, ই-ব্যাংকিং বা ই-শপিং-এর মাধ্যমে, তার মূলেও এই সফ্‌টওয়্যার।

১১.৩.১ পরিণতি

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই গতিশীলতার কারণে বিশ্বায়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং তার ফলে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। এর পূর্বে সাম্রাজ্যবাদকে অবলম্বন করে যখন পুঁজিবাদ প্রসারিত হয়েছে তখন প্রয়োজন ছিল বিশ্বের নানা জায়গায় বিদেশি রাজনৈতিক প্রভূত্ব সরাসরি কায়েম করার। এখন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে পরিচালনা করার জন্য কয়েকটি প্রধান কেন্দ্র থেকে নির্দেশ প্রেরণই যথেষ্ট। বিশ্বব্যাপী এই বিরাট বাজার ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়ত যদি না যোগাযোগ ব্যবস্থা তার সহায়ক হিসাবে দেখা দিত। অপরদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রচার কল্যাণেই বিশ্ব বাজারে পণ্য ও পরিষেবার একটি সাধারণ গুণমান যেমন নির্ধারিত হচ্ছে, তেমনভাবে গড়ে উঠেছে একটি দুনিয়া জোড়া একমুখী উপভোক্তার সংস্কৃতি।

অর্থনীতি ছাড়া ও কূটনীতি এমনকি সমর কৌশলও অতি সহজে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দ্রুতগামী যোগাযোগের

মাধ্যমে, উপগ্রহ মাধ্যমে তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণ বর্তমানে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিযোগী রাষ্ট্রকে গোপনীয়তার আবরণ থেকে প্রকাশ্যে টেনে আনছে।

তবে বিশ্বায়নের যুগে মানুষের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিরাপত্তা এখন নানাভাবে বিপন্ন হচ্ছে। নাশকতা শুধু সংগঠিত সন্ত্রাসের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে না, অসংগঠিত, বিচ্ছিন্ন আক্রমণ ও ঘটছে ব্যক্তি মানুষের সম্পত্তি ও অধিকারের উপর। এই প্রবণতা ইতিমধ্যে সাইবার সন্ত্রাস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। বিশ্বায়ন তাই অবিমিশ্র কল্যাণ বহন করে আনছে না।

১১.৪ উপসংহার

বহুজাতিক সংস্থাগুলি প্রধানত অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে কাজ করলেও তাদের কাজের সীমা শুধুমাত্র আর্থিক বিষয়ে সীমাবদ্ধ নেই। তাদের আর্থিক নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা এমনকি সামরিক ক্ষেত্রেও তারা নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করেছে। মার্কিন সংস্থাগুলির পুঁজি বিনিয়োগের প্রধান ক্ষেত্র হল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি। বিশ্বের সম্পদ ব্যবসা বাণিজ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকটি দেশের অধীনে এসেছে।

তথ্য-প্রযুক্তির অভূতপূর্ব উন্নয়ন এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করছে। বিশ্বায়ন গতি পেয়েছে তথ্য-প্রযুক্তির (Information Technology) হাত ধরে New International Order-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে। তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি হয় ক্রেতা, তৈরি হয় তার চাহিদা এবং তার যোগাযোগ হয় বিক্রেতা বা উৎপাদকের সঙ্গে। বিশ্বব্যাপী এই বাজার ব্যবস্থা অসম্ভব হয়ে পড়ত যদি না এই দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা তার সহায়ক হিসাবে দেখা দিত। অর্থনীতি ছাড়াও কূটনীতি এমনকি সমর কৌশলও অতি সহজে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দ্রুতগামী যোগাযোগের মাধ্যমে। এ সত্ত্বেও বিশ্বায়ন অবিমিশ্র কল্যাণ বহন করে আনছে না। মানুষের বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর নিরাপত্তা নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

১১.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। বহুজাতিক সংস্থাগুলির উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

২। তথ্যপ্রযুক্তি কীভাবে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ বাহন হিসাবে কাজ করছে?

১১.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)*, কলকাতা, ২০০৭।

২। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

৩। Thomas Friedman : *Understanding Globalization*, New York, 1999।

একক-১২ ❑ বিশ্বায়ন এবং ঋণের ফাঁদ

গঠন

১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণে ঋণ দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্ব ব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- IMF-এর উদ্দেশ্য শুধু টাকা ধার নেওয়াই নয়, সত্যিকারে কাজ হল উন্নয়নমুখী দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, যে দায়িত্ব IMF পেয়েছে ধনী দেশগুলির সরকার, প্রাইভেট ব্যাংক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ফান্ড ও ব্যাংক এই দেশগুলিকে ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলে।
- যে উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে ব্যাংক ও ফান্ডের জন্ম হয়েছিল যে উদ্দেশ্য পূরণ করতে এই দুই সংস্থার পারেনি। এদের কাজকর্মও সন্তোষজনক নয়।

১২.১ ভূমিকা

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রেটন-উড চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থার জন্ম হয়। বিশ্ব ব্যাংকের সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন দেশকে উন্নয়নের জন্য ঋণ দেওয়া এর কাজের অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে

আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন দেশকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখা। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলির নির্দেশে এই সংস্থাগুলি পরিচালিত হওয়ায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ফান্ড ও ব্যাংক ঐ দেশগুলিকে নয়া ঔপনিবেশিকতার মোড়কে শোষণ করে সেই শোষণের ফলে অর্জিত মুনাফা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির স্বার্থে ব্যবহার করে।

১২.২ বিশ্বায়নে বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা

১২.২.১ বিশ্বব্যাংক

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে ব্রেটন-উড্‌স চুক্তির মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক (World Bank) এবং আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা (International Monetary Fund) বা IMF এই দুটি সংস্থার জন্ম হয়। বিশ্বব্যাংকের আসল নাম ছিল International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)। বিশ্ব ব্যাংকের সদস্যপদ পাওয়ার প্রাথমিক শর্ত হল আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্যপদ নেওয়া। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র বিশ্বব্যাংকের সদস্য। বিশ্বব্যাংকের অধিকর্তাদের মধ্যে আছেন প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও চেয়ারম্যান। বিশ্বব্যাংকের কয়েকটি Board of Governors আছে। এক একটি বোর্ড অব গভর্নরস তাদের ক্ষমতা ২০ জন Executive Directors-দের হাতে অর্পন করেন। বিশ্বব্যাংকের সদর দপ্তর ওয়াশিংটন। এর শাখা দপ্তর আছে টোকিও, লন্ডন, প্যারিস এইসব শহরে। বিশ্বব্যাংকের পুঁজির উৎস হিসাবে সদস্য চাঁদা, সিকিউরিটি বিক্রি এবং ঋণবাবদ সুদের উল্লেখ আছে। বস্তুতপক্ষে পুঁজি ও প্রশাসন দুটি ব্যাপারেই বিশ্বব্যাংক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল। বিশ্বব্যাংকের সংবিধানে উল্লেখ আছে, বিভিন্ন দেশকে উন্নয়নের জন্য ঋণ দেওয়াই এর কাজ।

বিশ্বব্যাংক নানা উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণের জন্য ঋণস্বরূপ অর্থ বরাদ্দ করেছে। কৃষি ও গ্রামীণ বিকাশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিষেবা, পুষ্টি, ক্ষুদ্র শিল্প, টেলিযোগাযোগ, পরিবহন, নগর উন্নয়ন, পানীয় জল ইত্যাদির জন্য ঋণ দিয়ে বিশ্বব্যাংক তার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়নমূলক কর্মসূচির রূপায়ণে এই ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১২.২.২ আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার

পশ্চিমী গণতান্ত্রিক শিবিরভুক্ত দেশগুলির উদ্যোগে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার বা International Monetary Fund বা IMF গঠিত হয়। IMF-এর যে সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল তাতে Board of Governors-এর ভূমিকা ছিল বেশি। Board of Governors-দের সংখ্যা ছিল ২২। এর সর্বোচ্চ পদাধিকারী হলেন Managing Director। এরও সদর দপ্তর ওয়াশিংটনে এবং স্বাভাবিক নিয়মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে।

IMF-এর কতকগুলি উদ্দেশ্য ছিল। এগুলি হল—বিভিন্ন দেশকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, মুদ্রা বিনিময় হারের স্থায়িত্ব সাধন, মুদ্রা বিনিময় হারের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া, সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আর্থিক দিক দিয়ে তার ভারসাম্য বজায় রাখা।

ব্রেটন-উড্স চুক্তি অনুযায়ী সদস্য দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা (IMF) থেকে প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে তাদের লেনদেন ঘাটতি বা বিদেশি মুদ্রার সংকট মিটিয়ে আর্থিক মন্দার হাত থেকে বাঁচতে পারে। IMF তহবিলে প্রত্যেক সদস্যকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ (Quota) জমা দিতে হয়। এই কোটার পরিমাণ নির্ভর করে দেশটির জাতীয় আয় ও বিদেশি মুদ্রার সঞ্চয়ের উপর। কোটার এক-চতুথাংশ সোনা জমা দিতে হয়, বাকিটা দিতে হয় দেশীয় টাকায়। তবে প্রয়োজনে special drawing right অনুযায়ী টাকা তুলে নেওয়ার অধিকার সদস্য দেশের আছে। একটি দেশের ঋণ পাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করে তার স্বর্ণজমার সীমার মধ্যে। এর পরেও আরও এক-চতুর্থাংশ ঋণ পেতে পারে। কিন্তু এর অতিরিক্ত ঋণ পেতে গেলে IMF-এর কঠোর শর্ত মেনে নিতে হয়।

IMF-এর উদ্দেশ্য টাকা ধার দেওয়াই নয়, সত্যিকারের কাজ হল উন্নয়নমুখী দেশগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা, যে দায়িত্ব IMF পেয়েছে ধনী দেশগুলির সরকার, প্রাইভেট ব্যাংক ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে। IMF ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক কোনো দেশের সঙ্গে স্ট্যান্ডবাই (Stand by) নামে একটি চুক্তির খসড়া তৈরি করে। এর পর ঋণ গ্রহণে ইচ্ছুক দেশটিকে শর্ত মেনে ইচ্ছাপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়।

১২.৩ ঋণের ফাঁদে তৃতীয় বিশ্ব

বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার-এর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল বলা যায় না। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিম ইউরোপে ও জাপানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন কার্য সমাপ্ত হলে এই ব্যাংক ও মুদ্রাভাণ্ডারকে অন্য লক্ষ্যে ব্যবহার করা হয়। এই লক্ষ্যটি হল বিংশ শতকের সত্তরের দশক থেকে বিশ্ব পুঁজিবাদের কাঠামোগত গভীর সংকট শুরু হলে ঐ দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে সমস্ত সংকটের বোঝা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর চাপিয়ে দেওয়া এবং ঐ দেশগুলিকে নয়া ঔপনিবেশিকতার মোড়কে শোষণ করে সেই শোষণের ফলে অর্জিত মুনাফা অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলির সংকট মোচনের জন্য ব্যবহার করা।

তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন দেশগুলির দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী ও অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলি ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে ফেলতে সচেষ্ট হয়। ফান্ড ও ব্যাংক এই দেশগুলিকে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষ ঋণ দিতে রাজি হয়। শর্তগুলি হল—

(১) ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারি খরচ হ্রাস করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য অন্যান্য সরকারি ব্যবস্থাগুলিকে বেসরকারিকরণ করে মালিকানা ভিত্তিতে চালাতে হবে।

(২) ব্যাংক, বীমা, বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে সব কিছুই বেসরকারি মালিকদের হাতে বিক্রি করে দিতে হবে।

(৩) সরকারি কর্মচারীদের সংখ্যা হ্রাস করতে হবে এবং সরকারি বিভাগ বেসরকারিকরণ করতে হবে।

(৪) রুগ্ন শিল্পগুলিকে বন্ধ করে দিতে হবে এবং সব শিল্পে ব্যাপকহারে কর্মী ছাঁটাই করতে হবে।

(৫) শিল্প, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে সমস্ত সামাজিক কাজকর্মই হবে মুনাফাভিত্তিক।

(৬) আমদানির উপর বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে পশ্চিমি দেশগুলির উৎপাদিত সামগ্রীর আমদানির ব্যবস্থা করতে হবে।

(৭) বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশে প্রবেশের সুযোগ করে দিতে হবে এবং তাদের কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা যাবে না।

এইসব শর্তগুলি আরোপিত হওয়ায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির সাধারণ জনগণ চরমভাবে শোষিত হচ্ছে এবং এই দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাধীনতা শুধু নয় রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বও খর্বিত হচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যতদিন শক্ত ছিল, ততদিন তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশকেই এই মহাজনির উপর কম নির্ভরশীল হতে হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে তাদের মার্কিনি ফাঁদে পড়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ১৯৮১-৯০ দশকে বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে তৃতীয় বিশ্ব প্রায় ১০০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ নেয়। ঐ সময়ে IMF-এর কাছে ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫৪ বিলিয়ন ডলার। এই বিপুল পরিমাণ ঋণ এবং তার আনুষঙ্গিক শর্ত তৃতীয় বিশ্বকে নানাভাবে আঘাত করেছে।

প্রথমত, ঋণের চাপে পড়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে পারেনি। ফলে দারিদ্র সীমার নীচে থাকা মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ব্রাজিল, চিলি, ঘানা, জামাইকা, পেরু, ফিলিপিন্স প্রভৃতি দেশে।

দ্বিতীয়ত, ঋণের শর্ত মানতে গিয়ে অনেক দেশ বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন করতে বাধ্য হয়েছে, বাধ্য হয়েছে উন্নত দেশ থেকে সার আমদানি করতে। নিজেদের খাদ্যশস্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় আবার ঋণ করে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হচ্ছে। এইভাবে ঘানায় কোকো, সেনেগাল, জাম্বিয়াতে চিনাবাদাম, তানজানিয়ায় কফি, কেনিয়ায় চায়ের চাষ হচ্ছে।

তৃতীয়ত, সদ্য স্বাধীন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ঐতিহাসিক কারণেই শিল্পে অনুন্নত। তাই এই দেশগুলি শিল্পজাত সামগ্রী, যন্ত্রপাতি এবং জ্বালানি তেলের উপর আমদানি নির্ভর, আর এই দ্রব্যগুলি আমদানি করা যায় ঐ দেশগুলির নিজস্ব মুদ্রার মাধ্যমে নয়। উন্নত দেশগুলির মুদ্রা বা Hard Currency যেমন ডলার, পাউন্ড, মার্ক ইত্যাদির সাহায্যে। বেশিরভাগ গরিব দেশের শিল্পায়ন হয়েছে বৈদেশিক ঋণের ওপর নির্ভর করে। জেফ-ফ্রাইডেন (Jeff-Frieden) তাই ব্রাজিল, মেক্সিকো, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের শিল্পোয়নকে 'ঋণ নির্ভর শিল্পায়ন' বা 'Indebted Industrialization' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর ঋণে ডুবে যাওয়ার পরিণাম জেনেও এই দেশগুলিকে উন্নয়নের আশায় ঋণ নিতে হয়।

১২.৪ আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাংকের কার্যকারিতা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপের দেশগুলির আর্থিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে সহায়তা দানের জন্য বিশ্বব্যাংক এবং IMF গঠিত হয়েছিল। অনেকের মতে যে উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে এই দুই সংস্থার জন্ম হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে এই দুই সংস্থা পারেনি। উন্নত ও উন্নয়নশীল

দেশগুলির মধ্যে আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্য ছিল এই দুই সংস্থার। কিন্তু এই উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয়েছিল। পশ্চিম দুনিয়ার বিভ্রান্ত সংকীর্ণ ও অপরিণামদর্শী নীতির জন্য এই দুই সংস্থা কেবল উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়নি। এমনকি এই দুই অর্থনৈতিক সংগঠনের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি ঋণের ফাঁদে যেমন বিপন্ন হয়ে পড়েছে তেমনি IMF-এর নিজস্ব তহবিলও শূন্য হয়ে গেছে। IMF-এর তহবিলের ঘাটতি পূরণ করার জন্য এই দুই সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিচালক মাইকেল ক্যামডেসাস (Michael Camdessus) কিছু প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তার প্রস্তাব ছিল IMF-এর সদস্য রাষ্ট্রগুলির চাঁদা বা 'কোটার' হার বৃদ্ধি করতে হবে। কিন্তু এই প্রস্তাব কার্যকর হয়নি। জার্মান কেন্দ্রীয় ব্যাংক ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে IMF-এর সমালোচনা করেছে। তাদের বক্তব্য হল IMF তাদের ঋণ গ্রহীতা দেশের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি দেয়নি। উন্নত দেশগুলি বর্তমানে IMF-কে গুরুত্ব দেয় না।

ঋণের বোঝায় জর্জরিত দেশগুলি নানা সমস্যার মধ্যে পড়েছে। বিদেশি বাণিজ্যে অর্থনীতি, বৈদেশিক মুদ্রা সংকট, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করেছে। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে আলবেনিয়াতে রুটির জন্য দাঙ্গা হয়েছে, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ঋণ গ্রহণকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়েছে। এসবের পরিণতিতে IMF-এর গুরুত্ব কমে গিয়েছে। বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর নিকট ঋণ নেওয়ার অর্থ হল নিজের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা। আফ্রিকার ঘানা দেশটি IMF ও বিশ্বব্যাংকের সব শর্ত পূরণের ফল হিসাবে ১৯৮০-১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাধ্যতামূলকভাবে ঘানাকে খাদ্য আমদানি করতে হয়েছে। মুদ্রা ব্যবস্থার অবমূল্যায়ন ঘটেছে। কৃষিতে সারের ভর্তুকি হ্রাস করায় কৃষিতে এর ব্যবহার কমেছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যে কোনো ভারসাম্য না থাকায় বৈদেশিক ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিশ্বব্যাংক ও IMF নিজস্ব উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করতে পারেনি। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ঋণ দিয়ে তাদের সার্বিক দিক দিয়ে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিলেও নিজেদের কার্যকারিতাকে ধরে রাখতে পারেনি। বিশ্বায়নের প্রভাবে বেসরকারীকরণের জোয়ার এসেছে। তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলি IMF ও বিশ্বব্যাংকের কাছে দায়বদ্ধ না থেকে অন্যভাবে বিদেশি ঋণ গ্রহণ করেছে। এসবের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলির নিকট বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর প্রয়োজনীয়তা থাকছে না। অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বব্যাংকের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করে বলেন, বিশ্বব্যাংকের ধারণাতে গলদ আছে, তাদের কাজকর্ম সন্তোষজনক নয় এবং সে কারণে তৃতীয় বিশ্বে পুঁজির অনুপ্রবেশের যে ফল আশা করা হয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত পায়নি। IMF সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আর্থিক উদারীকরণ ও বিশ্বায়ন এর অন্যতম অভিভাবক ছিল IMF। যতদিন গিয়েছে ততদিন এই সংস্থার কার্যকারিতা নষ্ট হয়েছে। এটা ঠিক যে IMF-এর ঘোষিত নীতির সঙ্গে তার কাজের অনেক ফারাক আছে। IMF প্রকৃতপক্ষে পুঁজিবাদী দেশগুলির মুখপাত্র। পুঁজিবাদী দেশের নির্দেশ অনুযায়ী এই সংস্থা চলেছে। এই সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক অস্বচ্ছতা আছে। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রতিবেদন IMF নিজেই তার সীমাবদ্ধতা স্বীকার করেছে।

১২.৫ উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে যুদ্ধে বিধ্বস্ত ইউরোপের দেশগুলির আর্থিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়াকে সহায়তা দানের জন্য বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার গঠিত হলেও সেই উদ্দেশ্য পূরণ করা এই দুই সংস্থার পক্ষে সম্ভব হয়নি। পশ্চিম দুনিয়ার বিভ্রান্ত সংকীর্ণ ও অপরিণামদর্শী নীতির জন্য এই দুই সংস্থা কেবল উদ্দেশ্য পূরণেই ব্যর্থ হয়নি, এমনকি এই দুই অর্থনৈতিক সংগঠনের নিজেদের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

১২.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল? উদ্দেশ্যগুলি পূরণে এই দুই সংস্থা কতদূর সফল হয়েছিল?

২। বিশ্বব্যাংক এবং আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর কী প্রভাব ফেলেছিল?

৩। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাংকের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করুন।

১২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)*, কলকাতা, ২০০৭।

২। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৬।

৩। মৃণালকান্তি চট্টোপাধ্যায়—*সমসাময়িক বিশ্বের ইতিহাস*, কলকাতা, ২০২০।

পর্যায় ৪ : উত্তর ও দক্ষিণের সামাজিক আন্দোলন

একক-১৩ ❑ বিশ্ব পরিবেশ বিতর্ক : উত্তর ও দক্ষিণ বিভাজন

গঠন

১৩.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- পরিবেশ বিপর্যয় ও উষ্ণায়ন সমকালীন বিশ্বে সর্বাধিক বিপদ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে।
- পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন ও সীমাহীন ভোগবাদকে মূলত দায়ী করা হয়েছে।
- পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণগুলি মনুষ্যসৃষ্ট এবং এই বিপর্যয়ের জন্য দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলি অথবা উত্তরের উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলি দায়ী তা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।
- পরিবেশের উষ্ণায়ন ও বিপর্যয় নিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং জলবায়ু স্বাভাবিকীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

১৩.১ ভূমিকা

শিল্পায়িত নাগরিক সভ্যতার চাহিদা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় এবং এর ফলে পরিবেশের বিপর্যয় পৃথিবীতে প্রাণের বিলুপ্তিকরণের সহায়ক। এই কারণে অবিলম্বে পরিবেশ সংরক্ষণের সম্ভাব্য সব

রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক স্তরে যৌথভাবে এবং জাতীয় স্তরে নিজস্ব প্রয়াসে পরিবেশ বিপর্যয় রোধের কার্যক্রম রূপায়িত হওয়া সম্ভব।

১৩.২ পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ ও পরিণতি

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বিজ্ঞানী মহলে পর্যবেক্ষণ পরিমাপন, পরীক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবেশ বিপর্যয়ের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। পরিবেশ উষ্ণায়ন ও বিপর্যয় সমকালীন বিশ্বে সর্বাধিক বিপদ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়ন, শিল্পায়িত দূষণরোধে ব্যর্থতা, সীমিত প্রাকৃতিক ও জৈব সম্পদের অপচয়, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রাকৃতিক শক্তিগুলির নিয়ন্ত্রণ, রাসায়নিক এবং পারমাণবিক বস্তুর অপব্যবহার এবং আত্মঘাতী অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও সীমাহীন ভোগবাদকে দায়ী করা হয়েছে। সভ্যতার উন্মেষের পর থেকে মানুষ অবিরত চেষ্টা করে চলেছে প্রকৃতি থেকে যাবতীয় সম্পদ আহরণ ও নিষ্কাষণ করে তার অভাব মেটানোর। এই অভাব বর্তমানে সীমাহীন হয়ে দেখা দিয়েছে। পৃথিবীর ক্রমশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান জনগণের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক তাগিদ মেটাতে এবং তার ওপর বিত্তবান শ্রেণির বিলাসবহুল জীবনের নানা উপকরণ যোগান দেওয়ার প্রয়োজনে পৃথিবীর সম্পদের ওপর প্রচণ্ড টান পড়ছে। একদিকে প্রকৃতি থেকে অবিরত শোষণ এবং অপরদিকে ক্ষয়প্রাপ্ত প্রকৃতির পুনরুজ্জীবনের সচেতন প্রয়াসের অভাবের ফলে জল-বায়ু-মাটি, জলাশয় এবং জলজ ও স্থলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী সব কিছুই দুষণের শিকার। পৃথিবীর বুকে অরণ্য ক্রমেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে, বিলুপ্ত হচ্ছে নানা জীববৈচিত্র।

বায়ুদূষণ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রতি দশকেই বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভূপৃষ্ঠের ওপর থেকে সামান্য উর্দ্ধস্তরে জড়িয়ে থাকছে উষ্ণ গ্যাসীয় আস্তরণ। এই উষ্ণ গ্যাসীয় আস্তরণের বৈজ্ঞানিক নাম হল Greenhouse Gas যা ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে। এর পরিণাম হল Global Warming বা পৃথিবীর উষ্ণায়ন। কলকারখানা থেকে, বাতানুকূল গৃহ অভ্যন্তর থেকে, লক্ষ লক্ষ মোটর চালিত যানবাহন থেকে অবিরাম উত্থিত গ্যাস যা বায়ুমণ্ডলে মিলিয়ে যায় না, আটকে পড়ে এবং সঙ্গে থাকে বহন করে আনা কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন কণা। বায়ুমণ্ডলে CFC নামক গ্যাস কণার জমাট বাঁধার ফলে ভূপৃষ্ঠে গৃহীত সূর্যের তাপ বিকীর্ণ হতে পারে না এবং ঐ গ্যাসকণাগুলির উপস্থিতিতে Ozone স্তরের মধ্যে ছিদ্র সৃষ্টি হয়। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে মাঝামাঝি কুমেরু অঞ্চলের উপর ওজন ছিদ্র ধরা পড়ে, ভূপৃষ্ঠ থেকে আঠাশ কিলোমিটার উর্দ্ধে। ফলে সূর্যালোকের সঙ্গে আগত নানা মহাজাতিক রশ্মির স্পর্শে জীবদেহে ক্যানসার জাতীয় মারণব্যাধির উপক্রম হতে পারে। উষ্ণায়নের ফলে কুমেরু অঞ্চলের জমাট বাঁধা বিশাল বরফ গঠিত প্রান্তরে ভাঙন এবং তরলায়ন, যার ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের ক্রমেই স্ফীত হয়ে ওঠা ও পৃথিবীতে নিম্ন উচ্চতায় অবস্থিত বহু ভূখণ্ডের জলমগ্ন হয়ে তলিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

১৩.৩ পরিবেশ বিপর্যয় বিতর্ক : উত্তর ও দক্ষিণ

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণগুলি মনুষ্যসৃষ্ট এবং মানুষের সচেতনতা ও যৌথ চেষ্টার দ্বারা এগুলির দূরীকরণ সম্ভব বলে মনে করা হয়। এই ধরনের বিপথগামী সভ্যতার উদ্ধারে রাষ্ট্রের ভূমিকা রয়েছে।

উন্নায়নের নামে, শিল্পায়নের নামে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের নামে এ যাবৎকাল পর্যন্ত যে সব অপকর্ম ঘটেছে, রাষ্ট্র কখনো তার প্রত্যক্ষ সহায়ক, কখনো পরোক্ষ প্ররোচক, কখনো নীরব দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে পরিবেশ বিপর্যয় নিবারণের জন্য একক এবং যৌথভাবে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করার।

সম্প্রতি পরিবেশ সংরক্ষণ দায়িত্ব এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য কার দায়িত্ব বেশি তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ হিসাবে যে বিষয়গুলিকে দায়ী করা হয়েছে যেমন শিল্পায়ন, ভোগবাদ, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, নানা প্রয়োজনে বন নিধন, মোটরচালিত যানবাহনের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহার, যেগুলি বায়ুস্তরে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রীনহাউস গ্যাসপুঞ্জের ঘটনার সঙ্গে সরাসরিভাবে যুক্ত এবং পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান উষ্ণায়নের জন্য দায়ী—এর জন্য দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলির থেকে উত্তরের উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলির ভূমিকা অনেক বেশি হওয়ায় উত্তরের উন্নত দেশগুলিকে বেশি দায়ী করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উত্তরের উন্নত দেশগুলিকে দূষণের দায় স্বীকার করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ তৎপর হতে হবে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP)-র রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'There are more than 900 cars per thousand people of driving age in the US, more than 600 in western Europe and fewer than 10 in India. In America, there are more than two televisions on average per house, in Lybia and Uganda less that 1 house in 10 has a television. In the richest countries, average per capita water consumption per day is 425 litres, in the poorest it is 67. In the Industrialised country like US emits four times more CO_2 than China and India. The average British life style generates more GHGs in two months than at least developed country will take a year to produce'. [Quoted in Md. Kamal Uddin- 'Climate Change and Global Environmental Politics : 'North and South Divide', *EPL, Vol-47, Iss-3-4*]

এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব রয়েছে পরিবেশ বিপর্যয় নিবারণের জন্য একক এবং যৌথ উভয়েরই সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার। অনেক উন্নয়নশীল দেশের অভিমত হল যে উত্তরের দেশগুলি খুবই উন্নত হওয়ায় এবং এই উন্নত হওয়ার প্রয়োজনে প্রচুর পরিমাণ গ্যাসীয় পদার্থের উদ্গিরণ করেছে। উন্নত দেশগুলির উচিত বা প্রাথমিক দায়িত্ব হল গ্রীন হাউস গ্যাস কম পরিমাণে নিঃসারণ করা যার দ্বারা এর ক্ষতিকারক প্রভাব আর বৃদ্ধি না পায়। তা না হলে পৃথিবীর জলবায়ু বিপজ্জনকভাবে বেহাল হয়ে পড়বে। বিভিন্ন রাষ্ট্র তার সঙ্গতি ও সামর্থ অনুযায়ী এই দায়িত্ব পালন করবে।

প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহারের বিষয়ে উন্নত দেশগুলির উচিত দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতি নমনীয় নীতি অনুসরণ করার। উন্নয়নের প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার অপরিহার্য। উত্তরের উন্নত দেশগুলি এটি অস্বীকার করে এবং তাদের অভিমত হল—উন্নয়নশীল দেশগুলির জনগণ দরিদ্র, পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতার অভাবের কারণে তারা পরিবেশ দূষণ এবং বিপর্যয়ের জন্য প্রধানত দায়ী। উন্নত দেশগুলির অভিযোগের আঙুল তুলেছে উন্নয়নশীল দেশগুলির দিকে বিশেষত জনবহুল দেশ চিন ও ভারতের প্রতি যেখানে নাকি মানুষের চাপে দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, খাদ্য ভাণ্ডারে টান পড়ছে এবং উন্নয়নের

গতি বজায় রাখতে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে জ্বালানি তেল ব্যবহার করা হচ্ছে। শিল্পায়িত অতি-অগ্রসর সভ্যতার প্রতীক দেশগুলি দূষণের দায় নিজেরা না স্বীকার করে চেষ্টা করে চলেছে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করার। অপর পক্ষে অনুন্নত দুনিয়ার পক্ষ থেকে সংগতভাবেই আপত্তি জানিয়ে বলা হচ্ছে অনুন্নয়নের দায় নিতে হবে পশ্চিম উন্নত দুনিয়াকে। কারণ ঔপনিবেশিক পর্বে অনুসৃত শোষণ নীতির ফলেই অনুন্নত দশায় ভুগছে তৃতীয় দুনিয়ার দেশগুলি। উন্নত দেশগুলির শিল্প প্রযুক্তি ও ভোগবাদী জীবনযাত্রা প্রকৃতিকে যেভাবে ধ্বংস করছে, তার পরিমাণ বহুগুণ বেশি অনুন্নত দুনিয়ার তুলনায়।

১৩.৪ পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

পরিবেশের উষ্ণায়ন এবং বিপর্যয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে প্রমাণিত সতর্কবাণীকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক সমাজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এই পরিস্থিতিতে জলবায়ু স্বাভাবিকীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ ভাবনার প্রথম সংগঠিত প্রকাশ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আহুত OSLO বিশ্ব সম্মেলেন (১৯৭২) যেখানে থেকে UN Environment Programme (UNEP)-এর উদ্ভব। এই প্রথম একটি স্থায়ী সরকারি মঞ্চ সৃষ্টি হয় পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলি পর্যালোচনা এবং যৌথভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের। আন্তঃরাষ্ট্রীয় উদ্যোগে যে সব ব্যবস্থাপনা চলছে তার ভিত্তি বহুপাক্ষিক চুক্তি বা Convention, যা UNO-র উদ্যোগে আহুত সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ক্রমে সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অনুমোদনের পর আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা পেয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য পরিবেশ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল হল 'The Framework Convention on Climate Change' অর্থাৎ আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে কাঠামোগত চুক্তি (UNFCC 1992) এবং 'The Convention on Biodiversity' অর্থাৎ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত চুক্তি (২০০২)।

UNFCC-তে বায়ুস্তরে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাসপুঞ্জের ঘনীভবনের ঘটনাকে পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান উষ্ণায়নের কারণ বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এই গ্যাস নিঃসারনকে ধাপে ধাপে কমানো না গেলে পৃথিবীর জলবায়ু বিপজ্জনকভাবে বেহাল হয়ে পড়বে। উত্থিত গ্যাসের প্রকোপ কমানোর প্রয়োজন অনুভূত হলেও উত্থিত গ্যাসের প্রকোপ কমানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট মাত্রা বা পরিমাণ এই Convention-এ উল্লেখিত হয়নি। পরে কিয়াটো প্রোটোকল (Kyoto Protocol) UNFCC-র সংশোধনরূপ গৃহীত হয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর-এ জাপানের Kyoto শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে। বিশ্বে ১৬৬টি দেশ এতে যোগ দেয়। Kyoto Protocol আইনত বাধ্যতামূলক কতকগুলি দায় দায়িত্ব নির্দেশ করে দিয়েছে। শিল্পে অগ্রসর দেশগুলিকে বলা হয়েছে তাদের সম্মিলিত গ্রীন হাউস গ্যাসের পরিমাণ ২০০৮ থেকে ২০১২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এমনভাবে কমিয়ে আনতে হবে যে অবশিষ্ট পরিমাণ ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গড়পড়তা পাঁচ শতাংশ মতো হ্রাস পায়। সেজন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন যেমন জ্বালানি তেল ও কয়লার ব্যবহার কমানো, জীবাশ্ম ঘটিত-র বিকল্প শক্তির উৎস যেমন সৌর শক্তি, তরঙ্গ শক্তি, বাতাসের শক্তি-র সন্ধান ও ব্যবহার, গ্যাস উদ্‌গীরণকারী শিল্পগুলিতে আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা উদ্‌গীরণ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। Kyoto

Protocol-এর বিধি-বিধান কার্যকরী করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন Compliance Committee গঠিত হয়েছে।

১৩.৫ উপসংহার

পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণগুলি মনুষ্যসৃষ্ট এবং মানুষের সচেতনতা ও যৌথ চেষ্টার দ্বারা এগুলি দূর করা সম্ভব বলে মনে করা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব রয়েছে পরিবেশ বিপর্যয় নিবারণের জন্য একক এবং যৌথভাবে সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করার। পরিবেশ বিপর্যয়ের জন্য যে কারণগুলিকে মূলত দায়ী করা হয় যেমন শিল্পায়ন, ভোগবাদ, জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, নানা প্রয়োজনে অরণ্য নিধন, মোটর চালিত যানবাহনের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যবহার সেগুলি বায়ুস্তরে মনুষ্যসৃষ্ট গ্রীন হাউস গ্যাসপুঞ্জের ঘটনার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং পৃথিবীর ক্রমবর্দ্ধমান উষ্ণায়নের জন্য দায়ী— এর জন্য দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলির তুলনায় উত্তরের উন্নত শিল্পায়িত দেশগুলির ভূমিকা বেশি হওয়ায় উত্তরের দেশগুলিকে বেশি পরিমাণে দায়ী করা হয়েছে। পরিবেশের উষ্ণায়ন এবং বিপর্যয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে প্রমাণিত সতর্কবাণী নিয়ে আন্তর্জাতিক সমাজ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত এবং জলবায়ু স্বাভাবিকীকরণের জন্য আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে প্রণীত বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য পরিবেশ আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দলিল—'আবহাওয়া পরিবর্তন সম্পর্কে কাঠামোগত চুক্তি (১৯৯২)' ও 'জীববৈচিত্র সংরক্ষণ চুক্তি (২০০২)'। Kyoto Protocol (1997) পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

১৩.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ ও পরিণতি ব্যাখ্যা করুন।

২। পরিবেশ বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে উত্তর এবং দক্ষিণ-এর বিতর্ক বর্ণনা করুন।

৩। পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক স্তরে কী ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে?

১৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক*, কলকাতা, ২০০৯।

২। Md. Kamal Uddin, 'Global Environmental Debate and the North-South Divide'—*EPL, Vol-47, Nos-3-4*, pp. 106-114, 2019।

একক-১৪ ❑ বিশ শতকে ভারত তথা বিশ্ব নারীবাদী আন্দোলন

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নারী সমাজের স্বাতন্ত্রে মণ্ডিত হওয়া হল নারীবাদী আন্দোলনের লক্ষ্য।
- মানবাধিকার আন্দোলনের অংশ হিসাবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন।
- ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে নির্বাচনে ভোটাধিকার অর্জন এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্জন করলেও বিশ শতকের শেষে রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে ছিল।
- ভারতবর্ষের নারী আন্দোলনে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শোনা যায় বিশ শতকে সত্তরের দশকে।

- প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিভিন্ন গণআন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ অনবদ্য হলেও সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা ছিল বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার।

১৪.১ ভূমিকা

নারীর অধিকার সংক্রান্ত মতবাদ 'নারীবাদ' একটি বহু চর্চিত বিষয়। প্রথমে নারীবাদ ছিল মূলত সাহিত্যের আলোচিত বিষয়, বিংশ শতকের শুরুতে সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্বের আলোচনায় নারীদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফরাসি বিপ্লবের সময় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার যে আওয়াজ উঠেছিল তাতে বহু সংখ্যক নারীও সামিল হয়েছিলেন। কিন্তু সমান অধিকার বা সাম্যের কোনো ভাবনা তাদের জীবনে পরিবর্তন আনেনি। ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে কার্ল মার্কস-এর 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বিশ্বব্যাপী শ্রমিক বিপ্লবের কথা ঘোষণা করলে সেখানে নারীদের অধিকার সংক্রান্ত আলোচনা চলে আসে। ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে এঙ্গেলস্-এর *The Origin of the Family, Private Property and the State*-এ নারীর উপরে পুরুষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা, তাদের আগ্রাসী মানসিকতা এবং পুরষ নিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদের উল্লেখ তিনি করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজে পুরুষশাসিত মূল্যবোধগুলির পরিবর্তন হওয়া দরকার।

১৪.২ ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলন : বিশ শতক

১৪.২.১ প্রেক্ষাপট

নারীবাদ বস্তুত এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, দীর্ঘকাল ধরে যা একটু একটু করে নিজেকে তৈরি করে তুলেছে এক সর্বব্যাপী পিতৃতন্ত্রের তথা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি বিপ্লবের সময় দার্শনিক দিদারো স্পষ্ট ভাষায় ইউরোপীয় সমাজের নারী বিরোধী অবস্থানের সমালোচনা করেছিলেন। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে যখন অভিজাতদের বিরুদ্ধে ফরাসি সমাজের প্রতিবাদ দেখা দেয় তখন সেই প্রতিবাদে মেয়েরাও সামিল হয়। বাস্তিল দুর্গের ধ্বংসে যেভাবে মেয়েরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল, ঠিক একইভাবে ফ্রান্সের বিভিন্ন খাদ্য দাঙ্গা-র সময় তারা পথে নেমেছিল। কিন্তু ফরাসি বিপ্লব সম্পন্ন হলেও তখনই শুরু হয়নি নারী পুরুষের সমানধিকারের লড়াই। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী বিপ্লবের কেন্দ্রে থাকা পুরুষনেতারা গৃহে প্রয়োগ করতে চাননি। তারা ভাবেননি যে পুরুষের বিপরীতে কারুর কোনো বক্তব্য থাকতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে মেয়েদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি গণতান্ত্রিক সংগঠনের যার নাম ছিল 'Societe-des Revolutionaries Republicaines। এই সংগঠনের নেতৃত্বে ছিলেন Rose Claire। তিন বছর পর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে মেরি ওলস্টোনক্রাফট লেখেন *A Vindication of the Rights of Women*। এই গ্রন্থে চিহ্নিত হয় নারীর অধিকার কী কী, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার ওপরে কী ধরনের অবিচার চলে, পুরুষ কীভাবে নারীর ওপরে তার ইচ্ছে চাপিয়ে দেয় এবং ভালো না লাগলেও পুরুষের ইচ্ছার ক্রীড়নক হতে

না চাইলে ঘরে বাইরে ব্রাত্য সেই নারীর স্থান কোথায়, এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলে। *A Vindication of the Rights of Women* গ্রন্থে ফরাসি বিপ্লবে মেয়েদের যে ভূমিকা দেখা গিয়েছিল, সেই সূত্রেই মেয়েদের প্রাপ্য অথচ অস্বীকৃত স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে তুলে ধরা হয়। ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের এটাই প্রকৃত সূচনা বলা যায়। পুরুষতন্ত্রের মধ্যে অবস্থান করে প্রতিবাদী আন্দোলনের এই ধারাকে 'ফেমিনিস্ট' আখ্যা দেওয়া হয়। পুরুষের অনুকরণ নয়, নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে নারী সমাজের স্বাতন্ত্রে মণ্ডিত হওয়ার লড়াই এই আন্দোলনের লক্ষ্য।

১৪.২.২ মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন

বর্ণবৈষম্যের মতো লিঙ্গবৈষম্যও ছিল বিশ শতকের সূচনা পর্বের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের মানুষ হিসাবে ন্যূনতম অধিকারটুকুও দেয়নি। মানবাধিকার আন্দোলনের অংশ হিসাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন।

প্রথম বিশ্বযদ্ধ পর্যন্ত মেয়েদের অবস্থান সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা সমাজবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবেই ছিল। এই পর্বে সমাজ-রাষ্ট্র এবং উৎপাদনের বিকাশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পুরুষের প্রাধান্য স্বীকৃত ছিল। সমাজবিদ্যার চর্চা ছিল মূলত পুরুষকেন্দ্রিক। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে আধুনিক নারীবাদের মূল প্রশ্নগুলি প্রথম একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় ধরা পড়ে। মেয়েদের রাজনৈতিক গুরুত্ব, অর্থনৈতিক ভূমিকা এবং সামাজিক মর্যাদার দাবি জোরালো হয়। নারীবাদী ইতিহাস চর্চা সমাজতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে ওঠে।

১৯৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে Mary Baird-এর *On Understanding Women* এবং Oswald Spengler-এর *The Decline of the West* নামক গ্রন্থের প্রকাশনার মধ্য দিয়ে ইউরোপে মেয়েদের অবস্থান সংক্রান্ত প্রতিবাদী রচনার প্রচার শুরু হয়। মেরী বেয়ার্ড যুক্তিসহকারে দেখান যে, দাস সমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজের বিকাশ পর্যন্ত ইতিহাসের অর্ধেক স্রষ্টা মেয়েরা হলেও ইতিহাসে তার স্বীকৃতি বা উল্লেখ নেই। স্পেঙ্গলার-এর মতে, এই অবহেলার অন্যতম কারণ বিবর্তনের পুরুষতান্ত্রিক বাখ্যা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দু'খানি গ্রন্থ—Margaret Fuller-এর *Women in the Nineteenth Century* এবং John Stuart Mill-এর *The Subjection of Women* মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে ইউরোপে আলোড়ন তোলে। পুরুষতন্ত্রের মধ্যে নারীর এমন একটি সামাজিক অবস্থান, যা নিশ্চিতভাবে বন্দিদশা এবং তার বিরুদ্ধে অধিকারের কথা সচেতনভাবে সোচ্চার হয়ে বলা হয়।

বিশ শতকে ষাট-এর দশকে নারীবাদী আন্দোলনের মূল চিন্তাভাবনাকে সাহিত্য সমালোচনার কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু হয় এবং সাহিত্য পুনর্বিচারের এক নতুন দিগন্ত উন্মেচিত হতে শুরু করে। কেট মিলেট 'Sexual Politics' গ্রন্থটি লিখে নারীবাদের পটভূমির উন্মোচন ঘটান। ডি. এইচ. লরেন্স প্রমুখ উপন্যাসিক পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেন, সমালোচনা করেন। এছাড়া নারীবাদ নিয়ে লেখা হয় Simone-de Beauvoir-এর *The Second Sex* (1949), Moars-এর *Literary Women* (1973), Patricia Maire-এর *The Female Imagination* (1975) এবং Toril-এর *Feminist Literary Theory* (1985) প্রভৃতি গ্রন্থ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রপুঞ্জের উদ্যোগে এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পায়। ১৯৭০-এর দশকে প্রকাশিত রাষ্ট্রপুঞ্জের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, গোটা বিশ্বে মোট শ্রমসময়ের দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহার করে মেয়েরা অথচ উপার্জনের মাত্র ১০ শতাংশের ওপর তাদের অধিকার স্বীকার করা হয়। সমগ্র বিশ্বের উৎপাদনের মোট উপকরণের মাত্র ১ শতাংশ মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে আছে বলে দেখানো হয়। এই প্রতিবেদনে স্পষ্ট হয় যে, মোট শ্রম সময়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের মতো পুরুষ শ্রম ব্যবহার করা সত্ত্বেও মোট উপার্জনের ৯০ শতাংশের ওপর পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্রতিবেদন সমাজবিজ্ঞানীদের তীব্রভাবে নাড়া দেয়। সেই সূত্রে নারীবাদ বিষয়টি রাজনৈতিক আন্দোলনের বিষয়ে পরিণত হয়।

মেয়েদের করুণ অস্তিত্বের এই ছবির প্রেক্ষাপটে 'নারী-সত্তা' কেন্দ্রিক বৈষম্য, তার মাত্রা ও তার চরিত্র নির্ণয়ের জন্য মেয়েদের অভিজ্ঞতার নিরিখে গবেষণা শুরু হয়েছে যেখানে পরিবার, স্বাস্থ্য, কাজের সুযোগ ও ধরন, মানসিক সুস্থতা বা অসুস্থতা এসব প্রসঙ্গ যেমন উঠেছে, তেমনি বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে গুরুত্ব পেয়েছে যৌন হিংস্রতা কিংবা গণমাধ্যমে আচরণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি।

১৪.২.৩ নারী নেতৃত্ব

বর্ণবৈষম্য আর লিঙ্গবৈষম্যের প্রতিবাদে মেয়েদের কথা মেয়েদেরই নতুন করে বলতে হবে, লিখতে হবে আর পড়তে হবে, এই দায়বোধ থেকে তিনজন মহিলার নাম ছিল প্রথম সারিতে। এরা হলেন বেল হুক্স (Bell Hooks), টনি মরিসন (Toni Morrison) এবং অ্যালিস ওয়াকার (Alice Walker)। টনি মরিসনের রচনা *The Bluest Eye* (1970) প্রকাশিত হওয়ার পর নারীবাদের একটি বিকল্প ধারা গড়ে উঠেছে। ভোটাধিকার, নানা ধরনের সংরক্ষণ আর ব্রিটেনের 'National Organization for Women' জাতীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাই নারীবাদ নয়, এই ধারণা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। বিকল্প নারীবাদের লক্ষ্য তিনটি। প্রথমত, নারীবাদের সংজ্ঞার পরিবর্তন ঘটানো এবং তাকে সামগ্রিক মানবতাবাদের সঙ্গে যুক্ত করা। দ্বিতীয়ত, নারীবাদী আন্দোলনের ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিয়ন্ত্রণের সমালোচনা করা এবং তৃতীয়ত, মেয়েদের একটি স্বতন্ত্র নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 'National Institute for Women of Color' (NIWC)। Alice Walker নারীবাদের একটি বিকল্প শব্দও চয়ন করেছিলেন। Walker-এর মতে, Womanism-এর অর্থ অনেক গভীর এবং সমাজ থেকে মেয়েদের বিচ্ছিন্ন করে তাদের অধিকার অর্জনের কোনো উদ্দেশ্য 'Womanism'-এর নেই। Walker-এর বক্তব্যে মেয়েদের মানবিক স্বীকৃতির কথা বলা হয়েছে এবং মাতৃত্বের ভ্রান্ত ধারণার অবসানের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

১৪.২.৪ মেয়েদের অধিকার আন্দোলনের ধারা

বিশ শতকে সমগ্র বিশ্বে মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে এই আন্দোলনের তিনটি ধারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। একটি ধারা লক্ষ্য করা যায় পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্বে, দ্বিতীয় ধারাটি সমাজতান্ত্রিক দ্বিতীয় বিশ্বে এবং তৃতীয় ধারাটি গড়ে ওঠে অনুন্নত ঔপনিবেশিক তৃতীয় বিশ্বে। পুঁজিবাদী প্রথম বিশ্বের ধারাটি মূলত ছিল রাজনৈতিক অধিকারকেন্দ্রিক। এই রাজনৈতিক অধিকার অনেকাংশে নির্ভর

করে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কাঠামোর স্বীকৃত ভোটাধিকারের ওপর। যদিও এই ভোটাধিকার সংক্রান্ত বিষয়টি প্রথম আলোচিত হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে। লেনিন রুশ বিপ্লবের পর রাষ্ট্র পরিচালনায় মেয়েদের অর্ধেক অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে বিশ শতকে এই বিষয়টি গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী দুনিয়াতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিশ্বযুদ্ধে মেয়েদের নাগরিকত্ব, রাষ্ট্রের প্রতি তাদের একাত্মতা অত্যন্ত জরুরি বিষয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইংল্যান্ড ও জার্মানীর মতো রাষ্ট্রের কাছে এই সমস্যার সমাধান করা ছিল অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৪.২.৫ মেয়েদের রাজনৈতিক অধিকার

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগ মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে নির্বাচনে ভোটাধিকার অর্জন করেছে এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। নির্বাচনে অংশ নিতে সক্ষম হলেও মেয়েরা প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। স্থানীয় এবং আঞ্চলিক সরকার পরিচালনায় মেয়েদের অংশগ্রহণ অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক হলেও ইউরোপে মেয়েদের রাজনৈতিক ভূমিকা প্রসঙ্গে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 'their (women) influence and power was extremely small and grows still smaller as we approach the centre of political leadership'।

১৯৮০-র দশক থেকে শুরু করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং সমাজতত্ত্ববিদদের দ্বারা প্রকাশিত নানা গ্রন্থ, প্রবন্ধে মেয়েদের প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের অসুবিধাগুলি তুলে ধরা হয়। এই প্রতিবন্ধকতাগুলির মধ্যে ছিল প্রতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অর্থনৈতিক বিষয়। এগুলি ছিল পারিবারিক দায়দায়িত্ব, সমাজে প্রচলিত কিছু বাধা নিষেধ, মাতৃত্বের ভ্রান্ত ধারণা, চার্চের প্রভাব, শিক্ষাগত যোগ্যতার অভাব, চাকুরি এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলিতে স্বল্প প্রতিনিধিত্ব, রাজনৈতিক দল এবং নির্বাচনী ব্যবস্থার গঠন। শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত কিছু সুযোগ-সুবিধা পেলেও বিশ শতকের শেষেও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের ক্ষেত্রে মেয়েরা পিছিয়ে ছিল। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলি থেকে সংগৃহীত পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়—*Women are almost never represented in decision making positions in proportion to their presence in [an]....organisation, that there is extensive male resistance to women's participation in decision making and that the problems of reconciling the competing claims of personal life, working life and civil or public life are everywhere more difficult for women than men' [European commission : Employment and Social Affairs Directorate, Equal opportunities for women and Men in the European Union : Annual Report*, 1998, pp. 17, 49, Quoted in Ruth Henig and Simon Henig—*Women and Political Power, Europe Since 1945*, New York, 2001]

১৪.৩ ভারতের নারী আন্দোলন : স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে নারী শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পায় এবং বহু মধ্যবিত্ত নারী চাকরি এবং বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত হন। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে নতুন সাধারণতন্ত্রের ভিত্তি প্রাপ্ত বয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার হওয়ায় রাষ্ট্রে নাগরিকদের সম্পূর্ণ নাগরিকত্ব পাওয়ার প্রশ্নে কোনো বিতর্ক ছিল না। সাংবিধানিক নীতিতেও বলা হয়েছিল লিঙ্গ নির্বিশেষে সাম্যই হবে মৌলিক অধিকার। এই কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ভারতীয় নারী মনে করেছিল যে বাইরের জীবনে সাম্য, নাগরিকত্ব এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা স্বাভাবিক নিয়মে তাদের প্রাপ্য হবে। আধুনিকতা ও উন্নয়ন অন্যান্যদের মতো তাদেরও উন্নতির সহায়ক হবে।

নতুন নারী আন্দোলনের প্রেরণা আসে বিভিন্ন রাজনৈতিক দিক থেকে যেমন প্রগতিশীল বামপন্থীদের শ্রেণি অসন্তোষ, জাতপাতের আন্দোলনে, কাজের জন্য লড়াই, জমি, খাদ্য এবং মূল্যবৃদ্ধির মতো বিষয় থেকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্বে কংগ্রেস এক ধরনের জনপ্রিয় রাজনীতির বাতাবরণ তৈরি করে এবং ক্রমশ মূলস্রোতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতান্ত্রিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। একইসঙ্গে ভারতীয় বামপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে তৈরি হয় নতুন প্রগতিশীল গোষ্ঠী যারা গ্রাম ও শহরের দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করতে উদ্যোগী হয়। এভাবে নতুন সামাজিক আন্দোলনের সূচনা হয় যেখানে নারীদের কণ্ঠস্বর বিক্ষোভের প্রথম ভিত্তি খুঁজে পায়।

পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম তীব্র সমালোচনা শোনা যায় সত্তরের দশকে। মহারাষ্ট্রের ধূলিয়া জেলায় ভূমিহীন ভীল শ্রমিকদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে শহদা আন্দোলন। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নয়া বামপন্থীদের সহায়তায় তৈরি হয় শ্রমিক সংগঠন যারা গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে মহিলা সমতা সৈনিক দল (League of Women Soldiers for Equality) নামে দলিত মহিলাদের একটি সংগঠন তৈরি হয়। তাদের প্রচারের মূল বিষয় ছিল যৌন নির্যাতন যদিও তারা এর বাখ্যার সন্ধান করে শ্রেণি নয়, জাত ও ধর্মের মধ্যে। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করায় নারী আন্দোলনের তীব্রতা কিছুটা হ্রাস পায় কারণ এই সময় বহু বামপন্থী নারী আত্মগোপন করতে বাধ্য হন। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে থেকে কিছু নগরভিত্তিক নারী গোষ্ঠী তৈরি হয় যারা ছিল বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী। এই নারী গোষ্ঠীগুলি অধিকাংশই ছোট এবং অঞ্চলভিত্তিক হলেও দৃঢ়ভাবে বিভিন্ন শ্রেণি কাঠামোর যৌথ সাধারণ কর্মসূচিতে লিঙ্গ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিয়েছিল। কিছু কিছু অঞ্চলভিত্তিক সংগ্রাম ও ঘটতে দেখা যায় যেমন চিপকো আন্দোলন এবং বোধগয়া আন্দোলন। স্বশাসিত নাগরিক গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্বে আসেন প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সংস্থা এবং স্বাধীনতাপন্থী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম। এইভাবে নতুন নারীবাদী আন্দোলন একই সঙ্গে জনপ্রিয় এবং নারীবাদী রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে পড়ে।

১৪.৩.১ হিংসাত্মক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সত্তরের দশকে নারীর বিরুদ্ধে কিছু অভিনব হিংসাত্মক ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন নারীবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। সাধারণভাবে বলা হয় সন্ত্রাসের তিনটি ক্ষেত্র—পরিবার, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র। কিন্তু

কার্যত ক্ষমতার এই তিনটি কাঠামো পরস্পর সংযুক্ত হয়েই কাজ করে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সরকারি কারাগারে দুটি নারী ধর্ষণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে অন্ধ্রে রামিজা বাঈ-কে একসঙ্গে বেশ কয়েকজন পুলিশ ধর্ষণ করে। তার স্বামীকে হত্যা করা হয় কারণ সে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিল। এই ঘটনায় পুলিশের অপরাধ প্রমাণিত হলেও আদালত তাদের মুক্তি দেয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে মথুরা নামে ১৬ বছরের আদিবাসী মেয়েকে মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুর জেলায় দেশাইগজ থানার চত্তরে দুজন পুলিশ কর্মী ধর্ষণ করে। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে দেশের সুপ্রিমকোর্ট এই দুই পুলিশ কর্মীকে অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলে ধর্ষণ আইন সংস্কারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ধর্ষণ আইনের যে সংশোধনীটি পেশ হয় তাতে প্রচারের সব কটি সুপারিশ গৃহীত না হলেও ধর্ষণ আইনের বিরুদ্ধে প্রচার নারী আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করে।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে কিছু কিছু প্রতিবাদ, সামাজিক সংগঠন এবং কিছু মানবিক সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে পণপ্রথার এবং পণের দাবির উত্তরোত্তর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। ১৯৭০ সালে হায়দ্রবাদের প্রগতিশীল নারী সংগঠন পণপ্রথার বিরুদ্ধে নতুন করে প্রতিবাদ সংগঠিত করে। এই দশকের শেষ দিকে পণপ্রথা এবং বিবাহ-পরবর্তী সাংসারিক জীবনে নারীর ওপর নিগ্রহের বিরুদ্ধে দিল্লি আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। ‘স্ত্রী-সংঘর্ষ’ এবং ‘মহিলা দক্ষতা সমিতি’ প্রভৃতি সংগঠনের আন্দোলনের ফলে পণবিরোধী আইনের অনেক পরিবর্তন হয়। পারিবারিক হিংসা সৃষ্টিকারীদের গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে পুলিশকে বাড়তি ক্ষমতা দেওয়া হয়।

১৪.৩.২ নারীর অধিকার অর্জন

ভারতে পুরুষ এবং মহিলাদের সমান অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হলেও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে মহিলারা নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়। সেই কারণে মহিলাদের সুরক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে ভারতে বেশ কয়েকটি আইন প্রণয়ন করা হয়। এগুলির মধ্যে ছিল ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে পণ প্রথা রদ আইন, ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে কন্যা ভ্রূণ হত্যা বন্ধের উদ্দেশ্যে রচিত জন্মের আগে লিঙ্গ চিহ্নিতকরণ পরীক্ষা সংক্রান্ত আইন, অবৈধ নারী পাচার আইন ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আইন এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে সমহারে বেতন আইন প্রভৃতি।

আইনগুলির মূল অধিকারগুলি সংবিধানে উল্লেখিত অধিকার এবং নীতিগুলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হলেও ঐ-সব আইনের সঠিক পালন সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে মহিলাদের সচেতনতার অভাব ও ছিল। আইনি অধিকারগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে পুরুষদের অনীহা, উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাব মহিলাদের প্রাপ্য অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

প্রাক্-স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের বিভিন্ন গণআন্দোলনে নারীর অংশগ্রহণ ও অবস্থান অনবদ্য হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্র বৃদ্ধির কোনোও সুসংহত প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন কেবলমাত্র নারীর ভোট প্রদানের মাধ্যমে হয় না। রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন পদ্ধতি হল ক্ষমতা ও উন্নয়নের মধ্যকার একধরনের আন্তঃসম্পর্ক যা এই দুটি বিষয় সম্পর্কে এক ধরনের নতুন দিকের নির্দেশ দেয়। স্বাধীনতা-উত্তরকালে সংসদীয় গণতন্ত্রে নারীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ পেয়েছেন সামান্যই। সাধারণভাবে

সংসদ ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারী সদস্যের সংখ্যা খুবই অল্প। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আন্দোলনের স্বার্থে নারীকে ব্যবহার করা হলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতার শরিক করার মতো আগ্রহ পুরুষ অধ্যুষিত রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে কোনো ধারাবাহিক প্রচেষ্টা হয়নি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে এল. এম. সিঙভি কমিটি পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করে। মূলত এই কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে সব রাজ্যে পঞ্চায়েতের এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।

১৪.৪ উপসংহার

বর্ণবৈষম্যের মতো লিঙ্গবৈষম্যও ছিল বিশ শতকের সূচনাপর্বের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ মানুষ হিসাবে মেয়েদের ন্যূনতম অধিকারটুকুও দেয়নি। মানবাধিকার আন্দোলনের অংশ হিসাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন। বিশ শতকে সমগ্র বিশ্বে মেয়েদের অধিকারের আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগ মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে নির্বাচনে ভোটাধিকার অর্জন এবং নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে যদিও বিশ শতকের শেষেও মেয়েরা প্রকৃত রাজনৈতিক দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। পশ্চিম ইউরোপের মতো ভারতে পুরুষ এবং মহিলাদের সমান অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত হলেও সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা ছিল বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আন্দোলনের স্বার্থে নারীকে ব্যবহার করা হলেও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নারীকে রাজনৈতিক ক্ষমতার শরিক করার মতো আগ্রহ পুরুষ অধ্যুষিত রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষ থেকে কোনো ধারাবাহিক প্রচেষ্টা হয়নি।

১৪.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। বিশ শতকের ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

২। বিশ শতকে পশ্চিম ইউরোপে নারীবাদী আন্দোলনের পরিচয় দিন। নারীরা কি প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করতে পেরেছিল?

৩। স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ভারতের নারী আন্দোলনের পরিচয় দিন।

১৪.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Ruth Henig and Simon Henig—*Women and Political Power*, Europe Since 1945, New York, 2001।

২। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬)*, কলকাতা, ২০০৭।

৩। বাসব চক্রবর্তী সম্পাদিত—*নারী পৃথিবী : বহুস্বর*, কলকাতা, ২০১১।

একক-১৫ ❑ মানবাধিকার আন্দোলন

গঠন

১৫.০ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনি জানতে পারবেন

- মানবাধিকার বলতে বোঝায় মানুষ হিসাবে মানুষের স্বীকৃতি আর সামাজিক জীবনের বিকাশমুখীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার।
- ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় 'মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়।
- মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়।
- সব রাষ্ট্রে অধিকারের সম্প্রসারণ প্রত্যাশা অনুযায়ী না ঘটার কারণে অধিকার রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয়।
- সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ অধিকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সেগুলি মানবাধিকার আন্দোলনের সুদৃঢ়করণে সাহায্য করেছে।

১৫.১ ভূমিকা

মানবাধিকারের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ষোল-সতের শতকে ইউরোপ। যুদ্ধোত্তর বিশ শতকীয় বিশ্বে এই মানবতাবাদই সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা আর পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার আদায় ও রক্ষার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় 'মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়।

১৫.২ মানবাধিকার : সংজ্ঞা

নাগরিক অধিকার (Civil Rights) বা মানবাধিকার (Human Rights) বলতে বোঝায় মানুষ হিসাবে মানুষের স্বীকৃতি আর নাগরিক জীবনের বিকাশমুখীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার। এই অধিকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্যের পাশাপাশি ব্যক্তির প্রতি রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা ফলপ্রসূ হতে পারে এবং মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য বজায় থাকে। মানবাধিকার দেশকালে সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি সর্বজনীন ধারণা। সমগ্র বিশ্বের মানুষের সমস্ত ন্যায়সঙ্গত দাবির এ হল সংহত রূপ।

১৫.৩ মানবাধিকার আন্দোলন : প্রেক্ষাপট

মানবাধিকারের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল ষোল-সতের শতকে ইউরোপে ইরাসমাস ও ক্যাম্পানেলার খ্রিস্টীয় মানবতাবাদের ধারণায়; আর পেত্রাক, দাঁতে, ব্রুনো, দি-ভিঞ্চি, বেকন, শেকস্‌পিয়ারের ধর্মোত্তর মানবতাবাদে। যুদ্ধোত্তর বিশ শতকীয় বিশ্বে এই মানবতাবাদই সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা আর পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার আদায় ও রক্ষার আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

মানবসমাজে মূল্যবোধের বিকাশ ও বিবর্তনের সঙ্গে মানবাধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই অর্থে মানবাধিকারের প্রশ্নটি শুধুমাত্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক সুযোগ আদায়ে সীমাবদ্ধ নয়, তার তাৎপর্য বৃহত্তর মানব-কল্যাণের বিষয় বলে পরিগণিত। তাই শুধু রাষ্ট্র নয়, অন্য সব সত্তা ও সংস্থা যার ওপর মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গল নির্ভর করে, সেই সবই মানবাধিকার আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত।

এই ক্রমসম্প্রসারণশীল আন্দোলনের সূত্রপাত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীভৎস ধ্বংসলীলায়। সে সময় ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের প্রকাশ ঘটেছিল মানুষের সর্বপ্রকার স্বাধীনতা হরণে, ব্যক্তি-মানুষের মর্যাদার লঙ্ঘনে এবং উৎপীড়নের নৃশংসতায়। তাই যুদ্ধ শেষে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম শর্তই ছিল মানবাধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে সে কারণে মানবাধিকার ও মানব মর্যাদাকে সংরক্ষণের দৃঢ় সংকল্প ঘোষিত হয়। জাতিপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় বলা হয়, শুধু পরবর্তী প্রজন্মকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে মুক্তি দেওয়াই নয়, মানুষের মৌলিক অধিকার, আত্মমর্যাদা, মূল্যবোধ ও নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রতি পূর্ণ আস্থা ফিরিয়ে আনা। কারণ যুদ্ধের অবসান স্থায়ী শান্তির প্রতিশ্রুতি দেয় না, যদি না সেই সঙ্গে মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি সংরক্ষণের নিশ্চয়তা থাকে। জাতিপুঞ্জের মূল উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে তাই অন্যতম লক্ষ্য হল

মানবাধিকার, তথা জাতি, লিঙ্গ, ভাষা ও ধর্মনিরপেক্ষভাবে মৌলিক স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও বিস্তারের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুনিশ্চিত করা। এই দায়বদ্ধতা থেকেই মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার ধারণাটিকে মূর্ত করে তোলা এবং তার বিশ্বজনীন স্বীকৃতি আদায় করার জন্য ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় 'মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র' (Universal Declaration of Human Rights) গৃহীত হয়।

১৫.৪ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও মানবাধিকার

রাষ্ট্রসংঘ মানবাধিকারের ক্ষেত্রে যে সব উদ্যোগ নিয়েছে সেগুলি হল—মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮), গণহত্যা বিরোধী চুক্তিপত্র (১৯৪৮), শিশুদের অধিকার ঘোষণা (১৯৫৯ ও ১৯৯১), জাতিগত বৈষম্য বিরোধী ঘোষণা (১৯৬৩), ঔপনিবেশগুলিকে স্বাধীনতা দান বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬০), নারীজাতির বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ বিষয়ক ঘোষণা (১৯৬৭), ব্যক্তি মানুষকে নিগ্রহ ও নৃশংসতা বিরোধী ঘোষণা (১৯৭৮), ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বৈষম্য বিরোধী ঘোষণা (১৯৮১) এবং নারী অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৯২)।

এছাড়া রাষ্ট্রসংঘ প্রথম দিকে মানবাধিকার বিষয়ে দুটি চুক্তিপত্র রচনা করে (Conventions on Human Rights) যা ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে গৃহীত হয় এবং ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে।

১৫.৫ মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা

মানবাধিকার ঘোষণার অর্থ এই নয় যে মানবাধিকার সম্পূর্ণ রক্ষিত হবে। বিভিন্ন দেশের মতাদর্শগত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিরোধী, ধর্মীয় মৌলবাদ বা সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান ধারণা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে ওঠে, ফলে ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও এর বাস্তব প্রতিকার সম্ভব হয় না। মানবাধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিপুঞ্জের কার্যাবলী বিবিধ অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করতে হয়। একদিকে বারবার মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে অভিযুক্ত রাষ্ট্রের ওপর কোনো বিধিনিষেধ আরোপ বা সামান্যতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলেই অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে যে সব দেশ মানবাধিকার সম্পর্কে উদাসীন, এই উদাসীনতার কারণ হিসাবে অভ্যন্তরীণ এক্তিয়ারের যুক্তি দেখানো হয়।

এছাড়া বিভিন্ন দেশের সমাজ ব্যবস্থায় পার্থক্য এবং মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে সমস্ত অধিকার অগ্রাধিকার পায় না। পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক এবং পৌরঅধিকার যেমন বাক্-স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা, ভোটাধিকার-এর ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ যেমন কর্মের অধিকার, বেকারভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা ইত্যাদিকে গৌণ মনে করা হয়। অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অধিকার, কর্মীদের নিরাপত্তার রাজনৈতিক অধিকারের থেকে

বেশি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রশ্নে রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

১৫.৬ মানবাধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

মানুষের জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ, অস্তিত্বের স্বাধীনতা এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত হলেও মানবাধিকারের বিষয়টি রাজনীতি নিরপেক্ষ নয়। মানুষের অনেক অধিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার আনুকূল্য ছাড়া বাস্তবায়িত হতে পারে না। এই কারণে মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে দেখা যায় অধিকাংশই রাজনৈতিক অধিকার সব রাষ্ট্রে অধিকারের সম্প্রসারণ প্রত্যাশা অনুযায়ী ঘটে না। নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে এক রাষ্ট্র থেকে অন্য রাষ্ট্রে অধিকারের তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। স্বীকৃত মানবিক অধিকারগুলির লঙ্ঘন ও সংকোচনের ঘটনা ঘটে। এই পরিস্থিতিতে বঞ্চিত মানুষের সমর্থনে প্রাগ্রসর সমাজের মানুষের সহমর্মিতা জাগ্রত হয় এবং অধিকার রক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয়। এভাবে দেখা যায় ঔপনিবেশিক দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের কঠোর বর্ণবিদ্বেষী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠিত হয়। একইভাবে আন্তর্জাতিক সমাজ সচেষ্ট হয় ইজরেয়লী সরকারের আগ্রাসন ও সশস্ত্র দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে প্যালেস্তিনীয় আরবদের স্বাধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য। এছাড়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় ক্লিষ্ট, অর্ধাহারে মৃতপ্রায় আফ্রিকাবাসী সোমালিয়া, ইথিওপিয়া, রোয়ান্ডার অসহায় মানুষ বাঁচার অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে।

মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে সবকটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ছিল ঠাণ্ডা লড়াই প্রভাবিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমি গণতান্ত্রিক দেশগুলি সামাজিক অর্থনৈতিক সাম্যের অধিকারকে উপেক্ষা করেছে এবং তাদের বিদেশনীতিতে একমাত্র তাদের শিবিরভুক্ত ও সমর্থক রাষ্ট্রগুলিকে মানবিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ঠাণ্ডা লড়াইয়ের প্রাবল্য ছিল সর্বজনীন অধিকার প্রসারে বিশাল প্রতিবন্ধক। সে সময় বৈদেশিক সাহায্যের ক্ষেত্রে পছন্দসই দেশগুলিতে সাহায্য প্রেরণ এবং শত্রু পক্ষের দেশগুলির প্রতি বিমুখতা কূটনীতির স্বাভাবিক রীতি অনুসরণ করেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন মার্কিন আগ্রাসনের বিরোধিতা করায় ওয়াশিংটন থেকে ভারতকে প্রতিশ্রুত সাহায্যদান স্থগিত রাখা হয়, যদিও পাকিস্তানি স্বৈরশাসকদের সমর্থন ও আর্থিক সামরিক মদতদানে কোনো কুণ্ঠা লক্ষ্য করা যায়নি।

১৫.৭ মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্মধারার মূল্যায়ন

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে মানবাধিকার ঘোষণার পর ৩০টি ধারায় পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। অনেক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের সংবিধান রচনাকালে এই ঘোষণাটিকে অনুসরণ করা হয় মানবাধিকার বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ অধিকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে যেসব প্রস্তাব গ্রহণ করেছে সেগুলি মানবাধিকার আন্দোলনের সুদৃঢ়করণে সাহায্য করেছে। উদাহরণস্বরূপ, বর্ণবৈষম্যের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইজরায়েল জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন মঞ্চে বার বার নিন্দিত হয়েছে।

জাতিপুঞ্জের মানবাধিকার বিভাগের অধীন উদ্‌বাস্তু হাই কমিশনের দপ্তর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ সভার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে উদ্‌বাস্তুদের নানা সমস্যা সমাধানে এই দপ্তর প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। প্যালেস্টাইন, সোমালিয়া এবং প্রাচ্য দেশ থেকে উৎখাত হওয়া উদ্‌বাস্তুদের পুনর্বাসন এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়া জাতিপুঞ্জের প্রধান অঙ্গ হিসাবে মানবাধিকার রক্ষায় অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের উদ্যোগে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে নারীদের সামাজিক মর্যাদা পর্যবেক্ষণের জন্য কমিশন গঠিত হয়েছে যার ফলে নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও নির্যাতনের ঘটনাগুলি প্রকাশ্যে আসতে পেরেছে এবং এর প্রতিকার করা ও সহজ হয়েছে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত বিশ্বনারী সম্মেলন এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত প্রকাশ।

১৫.৮ উপসংহার

১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভায় 'মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র' গৃহীত হলেও বিভিন্ন দেশের মতাদর্শগত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক বিরোধ, ধর্মীয় মৌলবাদ বা সামন্ততান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিস্থিতিতে বঞ্চিত মানুষের সমর্থনে আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টি হয়। তবে মানবাধিকার সংরক্ষণের প্রাথমিক পর্যায়ে সব কটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ছিল ঠাণ্ডা লড়াই প্রভাবিত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বিশেষ বিশেষ অধিকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাব গ্রহণ করেছে যেগুলি মানবাধিকার আন্দোলনের সুদৃঢ়করণে সাহায্য করেছে।

১৫.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১। মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়?

২। মানবাধিকার আন্দোলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করুন।

৩। মানবাধিকার রক্ষায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভূমিকা কী ছিল?

৪। মানবাধিকার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৫। মানবাধিকার সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগের পরিচয় দিন।

১৫.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১। রাধারমণ চক্রবর্তী ও সুকল্পা চক্রবর্তী—*সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক,* কলকাতা, ২০০৪।

২। অলক কুমার ঘোষ—*আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বর্তমান বিশ্ব (১৮৭০-২০০৬),* কলকাতা, ২০০৭।

৩। Radharaman Chakraborti—*The UNO : A Study in Essentials,* K. P. Bagchi, Calcutta, 1998।

পর্যায় ৫ : আধুনিকতা এবং সাংস্কৃতিক রূপান্তর

একক-16 ❑ আধুনিকতা : অর্থ, সূচনা এবং দৃষ্টিভঙ্গি

গঠন

16.0 উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল আধুনিকতা বলতে কী বোঝায়, আধুনিকতার অর্থ এবং আধুনিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অবগত হওয়া।
- আধুনিকতা বলতে বোঝায় ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন যেখানে উন্নত মানব জীবন যাপনের শর্তসমূহ বিরাজ করে।
- অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানলোক পর্বে আধুনিকতার বিকাশ ঘটে। উনিশ শতকে শিল্পায়নের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাবে আধুনিকতার সম্প্রসারণ ঘটে।

16.1 ভূমিকা

আধুনিকতা শব্দটি আপেক্ষিক, সব প্রজন্মের নিকট তার যুগটি আধুনিক। ভলতেয়ার তাঁর সময়কালকে আধুনিক বলে গণ্য করেছিলেন, রেনেসাঁস যুগের মানুষেরা তাদের যুগকে আধুনিক বলে গণ্য করেন। সব দেশে আধুনিকতার চরিত্র এক নয়, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়কালকে আধুনিক আখ্যা দেওয়া হয়। আধুনিকতার

ব্যাখ্যা করা হয় মানুষের মনন ও বুদ্ধির বিকাশশীলতাকে ভিত্তি করে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা, মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি, প্রগতিশীলতা, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছিল তথাকথিত আধুনিকতা। আধুনিকতার মডেলটি এসেছিল ইউরোপ থেকে। মহাবিশ্বের অনেক রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে ধরা দেয়, পরমাণুর রহস্যভেদ করা সম্ভব হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সভ্যতার এক বিশিষ্ট্যরূপ হল আধুনিকতা। এর কেন্দ্রে ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রভাব পড়েছিল। মানুষ ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে অনেকাংশে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠেছিল, শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, বিবর্তনবাদ মানুষের লক্ষ্য ও পরিণতি নিয়ে আশার আলো দেখিয়েছিল।

16.2 আধুনিকতা : অর্থ

সাধারণভাবে আধুনিকতা বলতে বোঝায় ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তন যা সমাজজীবনে এক অনন্য এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিভাত হয়। এই পর্বে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে অতিক্রম করে বিজ্ঞান, কলা, প্রযুক্তি এবং বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্রুতগতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিকতা শব্দের উৎপত্তি লাতিন শব্দ 'Modernus' (Modo) থেকে যার অর্থ হল 'এক্ষুনি' (Just now)। এই শব্দটি ব্যবহৃত হয় বর্তমানের ঘটনা অথবা সমসাময়িক রাজনৈতিক অথবা সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে মানব জাতির উন্নততর অবস্থান উল্লেখ করে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায় যে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল ইউরোপে মধ্যযুগের অবসানের পর সাধারণভাবে চতুর্দশ বা পঞ্চদশ শতকে। এই সময় থেকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নানাবিধ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কলাবিদ্যা এবং বাণিজ্যের অগ্রগতির নিরিখে সামাজিক গতিশীলতা লক্ষণীয় হয়ে উঠে। মুক্ত সমাজের ধারণা, চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্কের বিন্যাস, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে স্থান করে নেয়। মানবজাতির উৎপত্তি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে অনুসন্ধান, বিজ্ঞানে জ্যোর্তিবিদ্যা এবং পদার্থবিদ্যার চর্চা নতুন ভাবনা চিন্তার বিকাশ ঘটায়, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ঘটে।

বৃহত্তর অর্থে আধুনিকতা কয়েকটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। এগুলি হল (ক) শিল্পায়ন, (খ) উন্নয়ন (গ) গণতন্ত্র (ঘ) পুঁজিবাদ (ঙ) ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব (চ) মুক্তবাণিজ্য (ছ) আশাবাদ (জ) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, সমাজ এবং রাজনীতি বিষয়ে চূড়ান্ত বা সম্পূর্ণ জ্ঞানের অনুসন্ধান (ঝ) আত্মসত্য উপলব্ধি যা অন্যান্য জ্ঞানের একমাত্র ভিত্তি এবং (ঞ) যুক্তিবাদ। আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি এই ইঙ্গিত দেয় যে আধুনিক সংস্কৃতি আশাবোধের জাগরণ ঘটায়, সামগ্রিকভাবে সমস্যা সমাধানে সহায়ক, মানবিক দুঃখ যন্ত্রণার উপশম ঘটায়, সামাজিক জীবন উন্নত করে। আধুনিকতা প্রাগ্রসর সমাজের জন্ম দেয় যেখানে উন্নত মানব জীবন যাপনের শর্তসমূহ বিরাজ করে।

16.3 আধুনিকতার প্রক্রিয়া

সমাজজীবনের এক অনন্য এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হল আধুনিকতা। পঞ্চদশ শতক থেকে আধুনিক সমাজের সূচনা হলেও সম্ভবত অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানালোক পর্বে সঠিক অর্থে আধুনিকতার বিকাশ ঘটে। উনিশ শতকে শিল্পায়নের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রভাবে আধুনিকতার সম্প্রসারণ ঘটে। বিশ শতকে বেশ কয়েকটি অ-ইউরোপীয় সমাজ যেমন অস্ট্রেলিয়া এবং জাপান আধুনিক শিল্পায়ত সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়। সাম্প্রতিককালে আধুনিকতা বিশ্বের একটি ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

16.4 পঞ্চাদশ ও ষোড়শ শতকে রেনেসাঁসের যুগ

রেনেসাঁস ইউরোপে নতুন যুগ ও নতুন মানসিকতার সৃষ্টি করেছিল। বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ, ধ্রুপদীবাদ ও মানবতাবাদ হল রেনেসাঁসের চরিত্র। ঐতিহাসিকরা ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মানব জীবনের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেন। ইতালির নগররাষ্ট্রগুলি সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক শিল্প নির্ভর রাষ্ট্র ব্যবস্থার সূচনা করেছিল। নবজাগৃতির কালে নতন করে জীবনের যে জয়গান গাওয়া শুরু হয়েছিল তার মধ্যেই নিহিত আছে আধুনিকতার উৎস। লিওনার্দো ব্রুনির মধ্যে এই প্রগতিবাদী চিন্তার ইঙ্গিত মেলে এবং এই প্রগতিবাদী চেতনা যে সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছিল, তার সঙ্গে এই ধ্রুপদী সাংস্কৃতিক চেতনার পুনরুত্থানের প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি তাদের এই যে অনুরাগ তার আনুসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ছিল মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির প্রতি তাদের বিতৃষ্ণা। পেত্রাকের কাছে ধ্রুপদী সংস্কৃতির পুনরুত্থান ছিল একটা নতুন যুগ প্রতিষ্ঠার পাথেয়। প্রাচীনকে পুনরুদ্ধার করে তারা এই নতুন যুগকে সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়েছিলেন।

চতুর্দশ শতকের গোড়ায় পেত্রাক যে নবজাগরণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার কিছুটা প্রভাব পড়েছিল উত্তর ইতালির নগরগুলির শিক্ষা ব্যবস্থায়। মধ্যযুগের শেষে বিশ্ববিদ্যালয় এবং ধর্মচর্চার প্রতিষ্ঠান ছাড়া তিন ধরনের বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান ছিল। পুরোনো পাঠ্যক্রমে যেভাবে শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্র পড়ানো হত, পেত্রাকের মনে হয়েছিল, তার অনেকটাই সে সময়ে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। তাই ছাত্রদেরকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পেত্রাক ইতিহাস, ধ্রুপদী সাহিত্য, যুক্তিশাস্ত্র এবং ভাষা চর্চার ওপর গুরুত্ব দেন। মানবতাবাদী দার্শনিকরা মানুষকে নতুন করে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ইতালির মানবতাবাদীদের ধর্মে অবিশ্বাস ছিল না, কিন্তু অনেকেরই খ্রিস্টিয় অনুশাসন সম্পর্কে সংশয় ছিল। পেত্রাক নিজেও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সংশয়ান্বিত হলেও সরাসরি চার্চের বিরোধিতা করেননি।

এই মানবতাবাদী বাস্তববাদী চেতনা সমাজদর্শন ও রাষ্ট্র দর্শনে তার ছাপ রেখেছিল। মানবতাবাদী রাষ্ট্রতত্ত্ব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হ্যান্স ব্যারন Civic Humanism-এর কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য হল যে রেনেসাঁস ইতালির নগরভিত্তিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে যেভাবে নাগরিকত্বের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল

তা প্রজাতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের প্রসারে সহায়ক হয়। এই প্রজাতান্ত্রিক মতাদর্শের একটি বৈশিষ্ট্য হল নাগরিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা। এর অপর বৈশিষ্ট্য হল রাজতন্ত্রবিরোধী মানসিকতা। ইতালির মানবতাবাদী দার্শনিকরা সকলেই যে রাজতন্ত্রবিরোধী ছিলেন তা নয়, এঁদের অনেকেই প্লেটোর বর্ণিত জ্ঞানী রাজা বা Philosopher King-এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। ম্যাকিয়াভেলি জীবনের একটি পর্যায়ে প্রজাতান্ত্রিক মতদর্শের অনুগামী হলেও তাঁর রচনায় রাজতন্ত্রের স্বপক্ষে বক্তব্য রেখেছেন। ম্যাকিয়াভেলির বিখ্যাত গ্রন্থ *The Prince* ছিল একটি রাজশক্তি কীভাবে নিজেকে সুরক্ষিত করবে সে সম্পর্কে। ম্যাকিয়াভেলির উপদেশ কিছুটা মেদিচি শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেই লেখা।

16.5 জ্ঞানদীপ্তির যুগ : যুক্তির কাল

ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক হল জ্ঞানদীপ্তির যুগ, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও বিজ্ঞানের উন্নতির যুগ। ঐতিহাসিকরা জ্ঞাদীপ্তির যুগকে যুক্তির যুগ বা Age of Reason নামে বর্ণনা করেন। দোকার্ত, গ্যালিলিও ও নিউটন হলেন এ যুগের পথপ্রদর্শক। জ্ঞানচর্চার যুগ থেকে ইউরোপ যুক্তিবাদের যুগে প্রবেশ করেছিল, প্রধান চিন্তানায়করা হলেন ভলটেয়ার, মন্টেস্কু, রুশো, ডিডেরো ও বিশ্বকোষ গোষ্ঠী। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, অনুমান ও সংশয়বাদ হল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। অষ্টাদশ শতকে চিন্তার জগতে যে বিপ্লব এসেছিল তার মূল কথা হল যুক্তি। মধ্যযুগের মানুষ অন্ধ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সব কিছু মেনে নিত। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনো বিষয়ে তারা প্রশ্ন তুলতো না। অষ্টাদশ শতকে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। এ যুগের মানুষ সব কিছু তর্কের আলোকে বিশ্লেষণ করে তবেই তা গ্রহণ করে।

জ্ঞানদীপ্তির প্রধানতম প্রবক্তা ছিলেন মন্টেস্কু (Montesquieu), ভলতেয়ার (Voltaire) ও রুশো (Rousseau)। মন্টেস্কু তাঁর গ্রন্থ 'পার্সিয়ান লেটারস'-এ সমকালীন ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র, রাজপরিবার ও সভার দুর্নীতিমূলক জীবন ও কার্যকলাপ, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সুবিধাবাদী অভিজাততন্ত্রের স্বার্থপরতার কথা তুলে ধরেন। ভলতেয়ার-এর আক্রমণের লক্ষ্যস্থল ছিল চার্চ। তিনি ছিলেন চার্চের দুর্নীতি ও গোঁড়ামির কঠোর সমালোচক। ভলতেয়ার কিন্তু নাস্তিক ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরবাদে আস্থাশীল ছিলেন। সহিষ্ণুতার নীতিতেও তিনি বিশ্বাস করতেন। রুশোর আদর্শ ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র। সাম্য ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে হলে জনগণের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই বলে তিনি মনে করতেন। রুশোর চিন্তাধারা সমসাময়িক ফ্রান্সকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। মন্টেস্কু, ভলতেয়ার ও রুশো ছাড়া ফিজিওক্র্যাট নামে পরিচিত কয়েকজন অর্থনীতিবিদ জ্ঞানদীপ্তির যুগে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার জ্ঞানলব্ধ ফসল জনসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন দিদেরো, হলব্যাখ, হেলভেটিয়াস প্রভৃতি দার্শনিক। এঁদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল অনেকগুলি খণ্ডে বিভক্ত বিশাল এক বিশ্বকোষ। জ্ঞানদীপ্তি যুগে উদ্ভুত যুক্তিবাদ,

মানবতাবাদ, বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি আধুনিকীকরণের আবির্ভাবে সহায়ক হয়েছিল। বস্তুত শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ আধুনিকতার আবির্ভাবে সহায়ক হয়নি, যুক্তিবাদ এক্ষেত্রে অন্যতম মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

16.6 শিল্পায়নের প্রভাব

আধুনিকতার আগমনে শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সনাতন সমাজ ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত উন্নয়নের অভাবে বেশির ভাগ মানুষ কৃষিকার্যের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করত। শিল্পায়ত আধুনিক সমাজে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। Anthony Giddens শিল্পায়ত আধুনিক সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করে লেখেন, *'A prime feature of industrial societies today is that a large majority of the employed population work in factories, offices or shops rather than agriculture. And over 90% of people live in town and cities, where most jobs are to be found and new job opportunities are created'*. শিল্পায়নের প্রভাবে শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। শিল্পায়নের পূর্বে নগরগুলি ছিল শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্র এবং তীর্থস্থান। শিল্পায়ন কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি করে। সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে মানুষের জীবন যাত্রা প্রভাবিত হল। শিল্পায়নের প্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। Anthony Giddens আধুনিকীকরণ এবং এর ফলাফল সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন এই প্রক্রিয়া শুধুমাত্র সাবেকি অর্থনীতিকেই প্রভাবিত করেনি, ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণের পক্ষেও সহায়ক হয়েছে। শিল্পায়নের প্রাথমিক পর্যায় থেকে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত হয়েছে. উন্নত মানের সামরিক অস্ত্র, সামরিক সংগঠনের বিষয়। এই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাগ্রসর অর্থনীতি, রাজনৈতিক সংহতি, সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব—যার ফলে বিশ্বব্যাপী অপ্রতিহত গতিতে পশ্চিমি অনুকরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব হয়েছে। রেনেসাঁস এবং জ্ঞানদীপ্তির যুগ সামাজিক ন্যায় এবং সাম্যের কথা তুলে ধরেছে, আধুনিকীকরণ প্রগতিশীল বিবর্তনের সূচনা করেছে। উন্নয়ন আধুনিকীকরণের বিশ্লেষণে সহায়ক। সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে পশ্চিমি দেশগুলি উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত হয়। এই দেশগুলিতে শিল্প, গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে উন্নয়ন লক্ষ্য করা যায়। এই দেশগুলি বিভিন্ন স্থানে তাদের ঔপনিবেশ স্থাপন করে এবং এক্ষেত্রে তাদের উন্নত সামরিক শক্তি এবং সম্পদ কাজে লাগানো হয়।

বলা যেতে পারে আধুনিকীকরণের সঙ্গে শিল্পায়ন এবং ধনতন্ত্র সম্পর্কিত। শিল্পায়নের কারণে উত্তরের উন্নত দেশগুলির তুলনায় দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে সম্পদের পার্থক্য থাকায় উত্তরের উন্নত দেশগুলি আধুনিক এবং দক্ষিণের উন্নয়নশীল দেশগুলি কম আধুনিকীকৃত হিসেবে চিহ্নিত। শিল্পায়ন এবং ধনতন্ত্র ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সহায়ক।

16.7 উপসংহার

অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে শিল্পায়নের সূচনা হওয়ায় যে উন্নয়ন বা প্রগতি লক্ষ্য করা যায় তা আধুনিকীকরণের সহায়ক হয়। Anthony Giddens আধুনিকতা বলতে উন্নয়ন বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে 'Development is modernity and modernity is development'। বৃহত্তর অর্থে আধুনিকতা শিল্পায়ন, উন্নয়ন, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্ব, মুক্ত বাণিজ্য, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি এবং যুক্তিবাদ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত। আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত বিষয়গুলি এই ইঙ্গিত বহন করে যে আধুনিক সংস্কৃতি আশাবোধের জাগরণ ঘটায়, সামগ্রিকভাবে সমস্যা সমাধানে সহায়ক, মানবিক দুঃখ যন্ত্রণার উপশম ঘটায়, সামাজিক জীবন উন্নত করে। আধুনিকতা প্রাগ্রসর সমাজের আবির্ভাব ঘটায় যেখানে মানবসমাজের উন্নত জীবনযাত্রা নির্বাহের শর্তসমূহ বিরাজ করে।

16.8 নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

1. আধুনিকতা বলতে কী বোঝায়? ইউরোপে আধুনিকতার সূচনা কীভাবে হয়েছিল?
2. ইউরোপে আধুনিকতার বিভিন্ন দিকগুলি আলোচনা করুন।

16.9 গ্রন্থপঞ্জি

1. Anthony Giddens — *The Consequences of Modernity*, U.K., 2012.
2. Bostrath and Peter Wagner — *European Modernity : A Global Approach*, 1st Edition, Bloomsbury Academic, 2017.

একক-17 ❑ সংস্কৃতি ও আধুনিকতা

গঠন

17.0 উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল কীভাবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর-আধুনিকতাবাদী দার্শনিকগণ ভাষাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন।
- উত্তর-আধুনিকবাদীরা সব প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে নতুন করে বিনির্মাণের কথা ভাবেন।

17.1 ভূমিকা

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীর সভ্যতার এক বিশিষ্ট্য রূপ হল আধুনিকতা। এর কেন্দ্রে ছিল ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি, প্রগতিশীল শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতি হল আধুনিকতার লক্ষণ। এই লক্ষণগুলি বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সময়ে অনুভূত হয়। ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্তির বাসনা, শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ, সমাজ কল্যাণ, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও বিবর্তনবাদ মানুষের লক্ষ্য ও পরিণতি নিয়ে ভাবনা ও সঠিক পথের অনুসন্ধান গুরুত্ব পায়। সংস্কৃতি শিল্প সাহিত্যের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহত্তর অঙ্গনে প্রবেশ করে। মানুষের অভ্যাস আচার আচরণ ও মানবিক মূল্যবোধ, বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিবাদ, নারীবাদ, ইউটোপীয় আদর্শে সমাজ গঠনের তাগিদ অনুভূত হয়।

17.2 চরমপন্থী বৌদ্ধিক আন্দোলন ও সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন

প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই প্রগতিশীল উন্নয়নকামী, স্থিতিশীল রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তানায়কদের সন্দিহান ও সংশয়বাদী করে তোলে। শুরু হয় চিন্তার রাজ্যে এক বিপ্লব। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ফ্রান্সে ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এর সূচনা। এই অগ্রগামী চরমপন্থী বৌদ্ধিক আন্দোলনের নেতারা সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কথা বলেন। এরা গণতন্ত্র ও নৃতত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত স্থিতিশীল

সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরোধিতা করে বলেন, শব্দ, ভাষা, বাচন, বাগধারা, উপমা সবই হল কর্তৃত্ববাদীদের সৃষ্টি, শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। দার্শনিক লয়োতার (Lyotard) সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু বর্ণনা রয়েছে তার সব কিছুর বিরোধিতা করেন। সব ব্যাখ্যাই বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেন। আগের চিন্তানায়করা যা নির্মাণ করেছেন তার বিনির্মাণের প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকরা যে ব্যাখ্যা দেন তা চিরন্তন বা শাশ্বত নয়, অস্থায়ী বর্ণনামাত্র, সত্যের স্বরূপ এরা ব্যাখ্যা করতে পারেন না। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের বক্তব্য হল বিশ্বজনীন সত্য বলে কিছু নেই। সব কিছুই আপেক্ষিক ধারণা। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্য সূক্ষ্মভাবে সঠিকভাবে সব কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না। এর কারণ হল ভাষার ভিন্নতা, প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য, দেরিদার অনুগামীরা এই তত্ত্বের সমর্থক। মানুষ ভাষা নির্মাণ করে নিজের কাল্পনিক সত্যের জগৎ তৈরি করে নিয়েছে। উত্তর-আধুনিকবাদীরা সব প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে নতুন করে বিনির্মাণের কথা ভাবেন। বিনির্মাণকারীরা বলেছেন, সব ভাষার মধ্যে প্রচুর উপমা, অলংকার এবং পারস্পরিক বিরোধিতা রয়েছে। এই কারণে উত্তর-আধুনিকতার এই দিকটি সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমালোচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

উত্তর-আধুনিকতা ও বিনির্মাণবাদীদের মতে সত্য নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। ইতিহাস হল সাহিত্যের মতো জ্ঞানের একটি শাখা, এর মধ্যে স্থান পেয়েছে অতিকথা, উপমা ও প্রথাগত ব্যবস্থা। সব কিছু সাহিত্যের মতো অতি পরিচিত। ইতিহাস তথ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবি করা হলেও বস্তুত তা মানুষের নির্মিত ইতিহাস বা বর্ণনা যা নতুন করে ব্যাখ্যা করা যায় সাহিত্যের মতো। উত্তর-আধুনিকতাবাদীদের ইতিহাসতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ কারণ মানুষের সংস্কৃতির সব কিছু এর নাগালে। ঐতিহাসিকরা বলতে পারেন না অতীত কেমন ছিল, বর্তমানে কেমন। এর অন্যতম কারণ হল ভাষার বাধা, যুগে যুগে ভাষার অর্থ পরিবর্তিত হয়, নতুন ভাষা বাচন ও উপমার আমদানি হয়। এরা সত্যকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে তার স্বরূপ আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়। কাল্পনিক উপন্যাস ও ইতিহাসের মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। ইতিহাসের সঙ্গে বিজ্ঞানের চেয়ে সাহিত্যের মিল বেশি। ঐতিহাসিক ও নাট্যকার সমকালীন তথ্য বা প্রবচন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর বিষয়কে সাজিয়েছেন। উত্তর-আধুনিকতাবাদী লেখক সাইমন স্কামা তাঁর *Citizens—A Chronicle of the French Revolution* (1989) এবং Orlando Figes তাঁর *A People's Tragedy—the Russian Revolution, 1891-1921* (1996), গ্রন্থে ইতিহাস বর্ণনাধর্মী সেটাই দেখিয়েছেন। নারীবাদী ঐতিহাসিকরা দেখিয়েছেন ইতিহাসের বর্ণনায় লিঙ্গ বৈষম্য রয়েছে, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তথ্য সাজিয়েছেন পুরুষের স্বার্থে। মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা বাচনহীন, ক্ষমতাহীন, তাঁরা ইতিহাসে এভাবে চিত্রিত হন। কিন্তু কেন তারা বাচনহীন বা শক্তিহীন ঐতিহাসিকদের বিশ্লেষণে তার উত্তর নেই।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ইতিহাস চর্চার ওপর ফরাসি ভাষাতত্ত্ব, দর্শন ও সাহিত্যতত্ত্বের প্রভাব হল সর্বাধিক। মিশেল ফুকো, জাক দেরিদা দেখিয়েছেন যে ভাষার ও শব্দের গঠনে, অর্থে ও বিবর্তনে অনেক পরিবর্তন ঘটে যায়। এই কারণে দলিলের পঠনে রূপান্তর ঘটে। শব্দের মধ্যে অনেক জটিলতা এবং অস্পষ্টতা থাকে। এই সব স্পষ্ট করার জন্য দেরিদা গঠন করেন লেখবিজ্ঞান। অর্থ কী, তাৎপর্য কী, চিহ্ন-চিহ্নক, চিহ্নিত এইসব সংকেতের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা গড়ে তোলেন। ব্যক্তিভাষা, সামাজিক ভাষা ইত্যাদি ধারণাগুলি তিনি বিনির্মাণের কাজে ব্যবহার করেন। লেখকের সঙ্গে লেখার সম্পর্ক, লেখকের উপস্থিতি, রীতি ও কৌশল নিয়ে দেরিদা আলোচনা করেছেন। মুখের ভাষা ও লেখার মধ্যে যে পার্থক্য ও স্ববিরোধিতা থাকে তাকে তিনি স্পষ্ট

করে দেখিয়েছেন। মন, উপস্থিত, অনুপস্থিত, নারী-পুরুষ, সাদৃশ্য ও পার্থক্য ইত্যাদি বিভিন্নতা দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এদের একটি অন্যের ওপর প্রভুত্ব আদায় করে বা সুবিধা ভোগ করে। ভাষার মধ্য দিয়ে তিনি সমাজতত্ত্ব, দর্শন ও ইতিহাসের আলোচনায় পৌঁছে গেছেন। দেরিদার প্রভাব পড়েছে সমাজ বিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকের ওপর, তাঁকে ও তাঁর বিনির্মাণ তত্ত্বকে কেউ অস্বীকার করেননি। দেরিদার প্রভাবে ঐতিহাসিকরা দলিল দস্তাবেজ পাঠ করতে শিখেছেন, এর ভাষাগত রূপান্তরের দিকে নজর রেখেছেন।

17.3 উপসংহার

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে উত্তর-আধুনিকবাদীরা সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সব প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে নতুন করে বিনির্মাণের কথা ভাবেন। সভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু বর্ণনা ইতিহাসে আছে তার সব কিছুর বিরোধিতা করেন। তারা সব ব্যাখ্যাই বিভ্রান্তিকর মনে করেন। বিজ্ঞানী বা ঐতিহাসিকরা যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা চিরন্তন বা শাশ্বত নয়, অস্থায়ী বর্ণনামাত্র। সত্যের স্বরূপ এরা ব্যাখ্যা করতে পারেননি। কারণ হল ভাষার ভিন্নতা, প্রকাশভঙ্গির পার্থক্য। যুগে যুগে ভাষার অর্থ পরিবর্তিত হয়, নতুন ভাষা বাচন ও উপমার আমদানি হয়। এরা সত্যকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে তার স্বরূপ আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়। বিনির্মাণকারীরা বলেছেন, সব ভাষার মধ্যে প্রচুর উপমা, অলংকার এবং পারস্পরিক বিরোধিতা রয়েছে। উত্তর-আধুনিকতার এই দিকটি সাহিত্যিক ও সংস্কৃতির সমালোচকদের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল।

17.4 নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

1. উত্তর আধুনিকতাবাদীরা প্রচলিত ব্যবস্থা ভেঙে কেন নতুনভাবে বিনির্মাণের কথা ভেবেছিলেন?
2. আধুনিকতাবাদীরা ইতিহাসচর্চায় কীভাবে ভাষাতত্ত্বের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন?

17.5 গ্রন্থপঞ্জি

1. Alan Swingewood–*Cutural Theory and the Problem of Modernity*, Macmillan, 1998.
2. David Harvey—*The Condition of Post Modernity : An Enquiry into the Origin of Cultural Change*, Cambridge, 1989.
3. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়—*পশ্চিমের ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, কলকাতা, ২০১৪।

একক-18 ❑ গণমাধ্যম (Media) এবং আধুনিকতা : সম্পর্ক

গঠন

18.0 উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন মিডিয়া বা গণমাধ্যম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকতার উপযোগী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।
- মুদ্রণ মাধ্যম এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা পশ্চিম ইউরোপের আধুনিকতার ধারা বিশ্বের অন্যত্র প্রসার লাভ করেছে।

18.1 ভূমিকা

আধুনিকতার সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করে মিডিয়া বা গণমাধ্যম আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজতত্ত্ববিদ John Thompson তাঁর গ্রন্থে *The Media and Modernity* (1995) আধুনিকতায় গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে স্বীকার করেছেন। যোগাযোগ বা সংযোগ স্থাপন, সংবাদ পরিবেশন-এর মধ্য দিয়ে আধুনিকীকরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাববিনিময়, আদান প্রদানের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক যুগে বাজার অর্থনীতি কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এর সাফল্যের পেছনে রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে নিয়মিত যোগাযোগ যার প্রয়োজন পরম্পরগত বাজার অর্থনীতি মেটাতে অক্ষম। উন্নত পরিবহন ব্যবস্থা, মৌখিক যোগাযোগ, খোলা বাজার এক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে। সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক বিষয়বস্তু ডিজিটালকরণ, ইন্টারনেট বিশ্বজুড়ে সামাজিক সম্পর্ক এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠাসমূহের রূপান্তরকরণে সহায়ক হয়েছে।

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে নিকট থেকে দূরের বিভিন্ন স্তরে মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে। বিগত শতকে নতুন মিডিয়া (New Media) যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে। বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেমন কমপিউটার, সেল ফোন, এম. পি-৩ প্লেয়ার্স, ডি.ভি.ডি, রেডিও, টেলিভশন যোগাযোগের গতিকে আরও দ্রুত করেছে। খুব সহজেই পৃথিবীর খবর নাগালের মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে। গণমাধ্যম অর্থনৈতিক উন্নয়ন ছাড়াও সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধুনিকতার উপযোগী পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

18.2 মুদ্রণ মাধ্যম ও আধুনিকতা

পশ্চিম ইউরোপের আধুনিকীকরণ এবং ক্রমশ তা বিশ্বের অন্যত্র প্রসার লাভ করার ক্ষেত্রে মুদ্রণ মাধ্যম-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। ছাপাখানা আবিষ্কৃত হওয়ার পর মুদ্রণ মাধ্যমের দ্বারা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা, নিয়মিত প্রকাশিত সংবাদপত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে ঘটে যাওয়া নানান ঘটনা, ক্রিয়াকলাপ জনসাধারণের গোচরে আসে। সচেতন জনগোষ্ঠী নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের সুচিন্তিত অভিমত পোষণ করে। এর ফলে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতিতে আমূল পরিবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি হয়। ঐতিহ্যগত বিধি সম্বলিত সমাজ ব্যবস্থা আধুনিক সমাজে রূপান্তরিত হয়, সাংস্কৃতিক উন্নতি জীবন জীবিকার রূপান্তর ঘটায়। পরবর্তীকালে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার যোগাযোগের মাধ্যমকে আরও গতিশীল করে তোলে। আধুনিক যুগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের আবির্ভাবের ফলে আধুনিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে থাকে। Mc Lucan বলেছেন 'global village'। সংবাদপত্রের সঙ্গে টেলিভিশিন, রেডিও, ইন্টারনেট, সেল ফোন আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের কোন্ স্থানে কী ধরনের ঘটনা ঘটছে তা নিমেষে জানা সম্ভব হয়েছে। এই আবিষ্কার শুধুমাত্র জনগণের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনেনি। সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আমূল পরিবর্তন আনে।

গণমাধ্যমের ভূমিকা প্রসঙ্গে Giddens বলেন, 'The transfer of information from one individual or group to another, whether in speech or through mass media played a significant role for society.' উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা জনগণের মধ্যে বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি করে, জনগণকে মানবিক করে তোলে এবং তারা যে বিচ্ছিন্ন নয়, সেই বোধ জাগিয়ে তোলে। ঐতিহ্যবাহী সমাজ ব্যবস্থায় কোনো বিষয় সম্পর্কে আলোচনার জন্য একত্রিত হওয়ার প্রয়োজন ছিল। Giddens বলেন, 'Pre-modern society did not recognize the differences between space and place notions which later become two distinct terms in modern society' প্রাক্ আধুনিক সমাজে সংযোগ স্থাপনের জন্য কোনো এক স্থানে সমবেত হওয়ার প্রয়োজন হলেও মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে তার প্রয়োজন হল না।

ছাপাখানা আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগের আধুনিক মাধ্যম-এর সূচনা হয়। মুদ্রণ শিল্প আবিষ্কৃত হলে বার্তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়, দূরবর্তী অঞ্চলে পাঠানো সম্ভব হয় এবং দীর্ঘদিন ধরে এটি সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রভাবের ফলে নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার হয় এবং এই সঙ্গে মুদ্রণ শিল্পের

প্রসার ঘটে। মুদ্রণ শিল্পের প্রয়োজনে বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়। Thompson উল্লেখ করেছেন যে মুদ্রণ শিল্পের প্রসারের ফলে বহু প্রকাশনা সংস্থার আবির্ভাব ঘটে এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর গ্রন্থ প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলির মধ্যে ছিল মেডিসিন, প্রাণীবিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র, ভূগোল-বিষয়ক গ্রন্থ, অঙ্কশাস্ত্র, বাণিজ্য-বিষয়ক গ্রন্থ প্রভৃতি।

পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা, সংবাদপত্র এবং অষ্টাদশ শতক থেকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে বাণিজ্য সংক্রান্ত তথ্য ইউরোপের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লেও তা ছিল শহুরে সম্পন্ন শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ। উনিশ ও বিশ শতকে প্রযুক্তিগত উন্নতি হওয়ায় কর-ব্যবস্থায় পরিবর্তনের সুবাদে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়, সংবাদ পরিবেশনে পরিবর্তন আসে। মিডিয়া শিল্পে পরিবর্তনের ফলে বিজ্ঞাপন এবং দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ বহু মানুষের নাগালে আসে। ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী পরিব্যপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়। Adorno এই বিষয়টিকে 'culture industry' হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এটিকে 'transformation of literature into a commodity' বলে বর্ণনা করেছেন। আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজি শিল্প গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে সীমাহীন যোগাযোগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই নাটকীয় উন্নয়ন পরিকাঠামোয় মুদ্রণ শিল্পে যে বহু শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তা পুঁজিবাদী শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইউরোপীয় সমাজে সাংস্কৃতিক উন্নতিতে মুদ্রণ শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ অবদান লক্ষ্য করা যায়। Thompson উল্লেখ করেছেন 'emergence of publishing houses was not only for economic activities but also places of gathering for clerics, scholars and intellectuals.' বিশেষত শিক্ষিত সমাজ প্রকাশনা সংস্থায়, কফি হাউস প্রভৃতি স্থানে সমবেত হয়ে সমসাময়িক সংবাদ বা ঘটনা সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিয়ে, বিতর্কের আয়োজন করে গঠনমূলক ভাবনা প্রকাশ করত, রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ-এর মূল্যায়ন করত। এই সব আলোচনা থেকে শক্তিশালী জনমত গড়ে ওঠে, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে মুদ্রণ সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব না হওয়ায় সূচনা হয় বাক-স্বাধীনতা, জনগণের মুক্ত চিন্তার বিকাশ।

মুদ্রণ মাধ্যমের অবদান লক্ষ্য করা যায় জাতীয় রাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদের উত্থানে। জাতীয় ভাষায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে জাতীয়স্বত্ত্বা এবং জাতীয়তাবোধ ত্বরান্বিত হয়।

18.3 বৈদ্যুতিন মাধ্যম ও আধুনিকতা

বিগত শতাব্দীতে টেলি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লব এলে দূরবর্তী স্থানে যোগাযোগের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আসে। দূরবর্তী স্থানে বৃহৎ সংখ্যক মানুষের সঙ্গে ইমেল, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে খুব সহজেই সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়। আন্তর্জাতিক যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে খুব সহজে পশ্চিমের আধুনিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিকাশের ধারা উন্নয়নশীল দেশগুলির পক্ষে অনুসরণ করা সহজ হয়।

আধুনিক উপাদানসমূহ অনুন্নত ভৌগোলিক অঞ্চলকে প্রভাবিত করায় তাদের আচার-আচরণ মূল্যবোধ আধুনিকতার উপযোগী হয়।

উন্নয়নের এই ধারা জনগণকে রাজনীতি সচেতন করে, জনমত তৈরি হয়, গণতন্ত্র রক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা প্রান্তিক অঞ্চলের জনগণ ও সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত হয়, নির্বাচনের সময় প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

18.4 উপসংহার

সমাজতত্ত্ববিদ John Thompson আধুনিকীকরণে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর—*The Media and Modernity* গ্রন্থে। পশ্চিম ইউরোপের আধুনিকীকরণ এবং ক্রমশ তা বিশ্বের অন্যত্র প্রসার লাভ করার ক্ষেত্রে মুদ্রণ মাধ্যম এবং পরবর্তীকালে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ঐতিহ্যগত বিধি সম্বলিত সমাজ ব্যবস্থা আধুনিক সমাজে রূপান্তরিত হয়, সাংস্কৃতিক উন্নতি জীবন-জীবিকায় পরিবর্তন আনে। সাম্প্রতিককালে বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড ডিজিটালকরণ, ইন্টারনেট বিশ্বজুড়ে সামাজিক সম্পর্ক এবং আধুনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের রূপান্তরকরণে সহায়ক হয়েছে। উন্নয়নের এই ধারা সমস্ত স্তরের জনগণকে রাজনীতি সচেতন করেছে যা গঠনমূলক রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেয়, উপযুক্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

18.5 নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

1. ইউরোপের আধুনিকীকরণে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করুন।
2. ইউরোপের আধুনিকীকরণে মুদ্রণ মাধ্যমের কী ভূমিকা ছিল?

18.6 গ্রন্থপঞ্জি

1. Yuyun Sunesti—'Media and Modernity : The Role of Printing Press in the Modernisation of Western Society', *Komunica*, Vol-5, no. 2 South Australia, July-Dec-2011.
2. Anthony Giddens—*Sociology*, Cambridge, 2006.
3. A. M. Noli, *The Evolution of Media*, Rownan & Littlefield, 2007.

একক-19 ❑ আধুনিকতা, নগরবাদ এবং আধুনিক ভোগ (Modernity, Urbanism and Consumption)

গঠন

19.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- আধুনিক ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের প্রভাব বেশি ছিল না।
- শিল্পায়নের যুগে কারখানায় তৈরি দ্রব্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই নগরায়নের সুবাদে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা এবং সামাজিক গতিশীলতার প্রেক্ষাপটে আধুনিক ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক ভোগ্যপণ্য বিশ্লেষকদের অনেকেই শিল্পায়নের ফলেই আধুনিক ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার শুরু হয়েছিল—একথা মনে করেন না।
- উনিশ-বিশ শতকে শিল্পায়িত সমাজে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার এবং ভোগ্যপণ্যে বৈচিত্র্য এসেছিল। নগরই ছিল মূলত আধুনিক ভোগ্যপণ্যের প্রাণকেন্দ্র।

19.1 ভূমিকা

বিশ শতকের শেষ দশক থেকে ভোগ্যপণ্যের বিষয়টি আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের আলোচনায় বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। উত্তর-আধুনিক যুগে পণ্যকরণের দ্রুত বিস্তার ঘটে। সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। Bourdieu, Douglas এবং Isherwood পণ্যকরণের এই দ্রুত বিস্তারের কিছু সামাজিক প্রভাবের উল্লেখ করেছেন। ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য এবং নতুনত্ব, প্রয়োজনীয়তা দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন আনে।

পার্ক, ঐতিহ্যমণ্ডিত ভবন, শপিং মল প্রভৃতি স্থানে পণ্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে পণ্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। প্রাক্-শিল্প যুগে সীমিত পণ্যকরণের কারণ ছিল সীমিত উৎপাদন এবং খণ্ড খণ্ড বাজারের অস্তিত্ব। শিল্প পুঁজির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পরিপূর্ণ বাজার গড়ে ওঠে এবং পণ্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। বাজারে মজুত পণ্য সামগ্রীর নতুনত্ব এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচার সাধারণকে আকৃষ্ট করে। উত্তর-আধুনিক যুগে উৎপাদন এবং ভোগের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক গোষ্ঠীর মানুষজন তাদের পছন্দ অনুযায়ী পণ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সামাজিক বিভাজন এবং প্রাত্যহিক জীবনের নতুন চাহিদার প্রেক্ষিতে ভোগ্যপণ্যের আমদানি হয়।

19.2 ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি

ইতিহাস এবং ভোগ্যপণ্য সংক্রান্ত পঠন পাঠনে ১৯৮০-র দশকে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। এই সব আলোচনায় আধুনিক ভোগ্যপণ্যের আবির্ভাবের সময়কাল এবং প্রতিবন্ধকতা নিয়ে বিভিন্ন মত পোষণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম না হলেও Mckendrick, Brewer এবং Plumb-এর *The Birth of a Consumer Society* (১৯৮১) গ্রন্থে বলা হয় যে আধুনিক ভোক্তা সমাজের আবির্ভাব ঘটে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে। আধুনিক ভোগ্যপণ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল প্রাক্-শিল্পায়ন পর্বে শিল্পীদের তৈরি উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে। তবে এই সব ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল শহর এলাকা। শিল্প যুগে উৎপাদনের প্রাচুর্যের সঙ্গে এর সম্পর্ক ততখানি গভীর ছিল না। শহরের বিভিন্ন ধরনের জীবন যাত্রায় সৌখিন, নৈপুণ্যের কদর করা হয়। Borsay, Corfield প্রমুখ এই অভিমত পোষণ করেন। আধুনিক ইংল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকায় গোড়ার দিকে এই সব কারণে আধুনিক ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। De vries, Wrigley মনে করেন 'English urbanisation was an intensifying process, rather than a stable state' ইংল্যান্ডের জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ ছিল বাণিজ্যিক ফসল চাষের সঙ্গে যুক্ত সম্পন্ন কৃষক, সম্পদশালী ব্যবসায়ী, শিল্পী। ইংল্যান্ডের ভোক্তা সমাজের মধ্যে রুচি সম্মত পণ্যের প্রতি আকর্ষণ ছিল। কৃষি এবং অকৃষি উভয় ক্ষেত্রেই আয়ের বিভিন্ন সুযোগ আর্থিক স্বচ্ছলতা এনেছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে আধুনিক ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার প্রসার লাভ করে। শিল্পায়নের ফলে প্রচুর পরিমাণ উৎপাদন এবং বিজ্ঞাপনের বিশেষ প্রভাব এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। Gregory *The Historical Geography of Industrialisation*, Williams *A Social History of the Home* এবং Campbell *The Ramantic Elite and the Sprit of Modern Consumption*-এ আধুনিক ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করেছেন। শিল্পায়ন, বিজ্ঞাপন এবং অনুকরণের ফলে বিশেষ ধরনের পণ্য ক্রয় করার প্রবণতা সমাজে লক্ষ্য করা যায় বলে এরা মনে করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ এবং পরবর্তীকালে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও আধুনিক ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। Mckendrick, Earle, Mc Craken, Thornton প্রমুখ বলেন যে এই পর্বে আধুনিক পণ্যদ্রব্য ভোগের প্রবণতা অভিজাত থেকে শুরু করে মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে প্রসার লাভ করে।

19.3 ভোগ্যপণ্যের প্রতি নাগরিক সমাজের আগ্রহ

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে আধুনিক ভোগ্যপণ্যের প্রতি চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সামাজিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশে বিশেষ বিশেষ পণ্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পেলেও ক্রমশ তা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। ভোগ্যপণ্যের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হল পণ্যের নতুনত্ব, কীভাবে ব্যবহৃত হবে সে সম্পর্কে ধারণা। চা, কফি, চিনি, চকলেট, তামাক, নতুন ধরনের পোশাক, কাঠসহ বিভিন্ন ধাতুর তৈরি পণ্য দ্রব্য আমদানির ফলে এগুলির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। পণ্যদ্রব্যগুলি মূল্যবান ধাতুর কারণে শুধু নয়, এগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা এবং আরামদায়ক অনুভূতি এগুলির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ব্যবসায়ী, দোকানদার, শিল্পীদের পক্ষ থেকেও দ্রব্যগুলির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধির চেষ্টা হয়। তবে নতুন ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার এবং এগুলির চাহিদা মূলত তৈরি হয়েছিল শহর এলাকায়। বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে শুধু নয়, ভোগ্যপণ্য সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল এগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে। মেলা, বাজার, দোকান প্রভৃতি বিক্রয়কেন্দ্রগুলিতে প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে দ্রব্যগুলির প্রতি নাগরিকদের আগ্রহ তৈরি হয়।

19.4 শিল্পজাত ভোগ্যপণ্য

উনিশ-বিশ শতকে শিল্পায়নের যুগে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে পরিবর্তন আসে। কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে কারখানায় উৎপাদিত দ্রব্য আগে থেকে বাজারজাত উন্নত মানের ভোগ্যপণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। শিল্পায়নের যুগে ভোগ্যপণ্য বেশি পরিমাণে উৎপাদিত হওয়ায় চাহিদায় প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে রুচির পরিবর্তন ঘটে, ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিক শ্রেণি পূর্বের তুলনায় ভোগ্যপণ্য ক্রয় করার প্রতি আগ্রহী হয়। জীবন ধারণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, ঘরবাড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও অন্যান্য দিকে যেমন ছুটির দিনে বেড়াতে যাওয়া, আনন্দ উপভোগ করার তাগিদ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মত তাদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিজ্ঞাপনের প্রকৃতিতে পরিবর্তন আসে। বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহারের ধরন, ভোক্তার নিকট স্পষ্ট হয়। এর ফলে ভোক্তার চাহিদাতে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একথা ঠিক যে, শিল্প পুঁজির আগমনের পূর্বেও যেমন ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে নতুনত্ব এবং সন্তুষ্টির বিষয় জড়িত ছিল, কয়েকটি ক্ষেত্রে শিল্প পুঁজির আগমনের পরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। উনিশ শতকে ভোগ্যপণ্যের প্রাচুর্য সত্ত্বেও স্বতন্ত্রভাবে দরজি কর্তৃক প্রস্তুত পণ্যের প্রতি কম আগ্রহ ছিল না। সাম্প্রতিককালে স্বতন্ত্রভাবে উৎপাদিত অনেক দ্রব্যই কারখানায় তৈরি উৎপাদন প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করেছিল বলে Samuel মনে করেছেন।

19.5 সাম্প্রতিককালে ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে পশ্চিমসমাজে দ্রব্যের পণ্যকরণে বিশেষ ধরনের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বাজারের চাহিদা অনুসারে দ্রব্য প্যাকেটজাত এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। বৈদ্যুতিন মাধ্যম যেমন টেলিভিশন, রেডিও, ভিডিও এবং কম্পিউটারের সাহায্যে দূরবর্তী এলাকায় ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন পৌঁছনোর ফলে ভোগ্যপণ্য ব্যবহারের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়নের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণিভুক্ত লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, কলকারখানায় মহিলাদের শ্রমিক হিসাবে কাজে যোগদানের ফলে ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি স্বাভাবিকভাবে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ে উৎসাহ যোগায়। উত্তর-আধুনিক যুগে পণ্য বিক্রয়ের কেন্দ্রস্থল হিসাবে শপিং মল, সুসজ্জিত সিটি সেন্টার, ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের সুযোগ করে দেয়। ১৯৬০ এবং ১৯৭০-এর দশকের পর ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে যে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল তা হল বিলাস দ্রব্যের আমদানি। বেশ কিছু বিশেষ ধরনের বিক্রয় কেন্দ্রের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণির মহিলা এবং পুরুষদের চাহিদা মেটানো।

19.6 উপসংহার

আয় এবং রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভোগ্যপণ্যের চাহিদায় পরিবর্তন-এর ফলে আধুনিক ভোগ্যপণ্যের গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক যুগে নগরায়ণ, অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সমাজে পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

19.7 নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

1. আধুনিক ভোগ্যপণ্যের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নগরায়নের ভূমিকা বর্ণনা করুন।
2. আধুনিক ভোগপণ্যের উপর একটি প্রবন্ধ লিখুন।

19.8 গ্রন্থপঞ্জি

1. Padurai A. (Ed.) *The Social Life of Things : Commodities in Cultural Perspective*, Cambridge, 1986.
2. Ewen S.—*All Consuming Images : The Politics of Style in Contemporary Culture*, New york, 1988.
3. Featherstone M—*Consumer Culture and Post Modernism*, London, 1991.

একক-20 ❑ আধুনিকতা একটি পশ্চিমি প্রকল্প—একটি পর্যালোচনা

গঠন

20.0 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন

- আধুনিকতা মূলত ইউরোপের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হলেও এটি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্টদের সম্পর্কিত।
- প্রাক্-আধুনিক থেকে আধুনিকতায় বিবর্তনের ইতিহাসে পশ্চিম ইউরোপে যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, পুঁজিবাদ, অর্থনৈতিক, সামরিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই উন্নয়নের ধারা বিশ্বে বিকাশ লাভ করেছিল।

20.1 ভূমিকা

অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকে কিছু মৌলিক, যুগান্তকারী পরিবর্তন ইউরোপে বিশেষভাবে পশ্চিম ইউরোপে ঘটেছিল। যুক্তিবাদ, পরিবেশগত বিষয়, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, শিল্পায়ন প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে ঘটে যাওয়া এই পরিবর্তনগুলি আধুনিকতার লক্ষণ। আধুনিকীকরণের বিস্তার অন্যান্য সমাজের সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। বলা যেতে পারে আধুনিক বিশ্ব দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

20.2 আধুনিকতা ও পশ্চিম ইউরোপ

আধুনিকতা ইউরোপের সাফল্যের অন্যতম নির্দশন। আধুনিকতা মূলত ইউরোপের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে প্রতিভাত হলেও এটি পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। সাম্প্রতিককালে আধুনিকতা পশ্চিম ইউরোপ থেকে উদ্ভুত হয়েছিল কিনা সে সম্পর্কে বিতর্ক হয়েছে। আধুনিকতার সংজ্ঞা এবং এর বিবর্তন বিশ্লেষণ করে বেশির ভাগ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে পশ্চিম ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় একটি উন্নত রূপ স্পষ্ট হয়েছিল এবং এই উন্নত সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে আধুনিকতার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের সংযোগ স্থাপন সম্ভব।

আধুনিকতার সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে আধুনিকতা বলতে কী ধরনের সাফল্য বা উন্নয়নকে বোঝানো হবে সে সম্পর্কে সকল বিশ্লেষক ঐক্যমত না হলেও আধুনিকতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, যার ভিত্তিতে একটি সমাজকে আধুনিক হিসেবে প্রতিপন্ন করা যায়।

অষ্টাদশ এবং উনিশ শতকে কিছু মৌলিক যুগান্তকারী সামাজিক পরিবর্তন ইউরোপে লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি মূলত পশ্চিম ইউরোপেই ঘটেছিল। আধুনিকতার বিবর্তনের ফলে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছিল তা পশ্চিম ইউরোপ থেকে উত্তর আমেরিকা এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে সম্প্রসারিত হয়। এই পরিবর্তনগুলি মধ্যে কয়েকটি হল যুক্তিবাদ, পরিবেশগত বিষয়, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন এবং শিল্পায়ন।

অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্স ইউরোপে জ্ঞান ও চিন্তার জগতে যে যুগান্তকারী আলোড়ন বা বিপ্লব এনেছিল, সংক্ষেপে তাকে বলা হয় জ্ঞানদীপ্তি বা Enlightenment। এটি আধুনিকতার লক্ষণ। ইউরোপের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক হল জ্ঞানদীপ্তির যুগ। যুক্তিবাদী দার্শনিকরা ঐতিহ্য বিশ্বাস, আচার আচরণকে অস্বীকার করে যুক্তিকে আশ্রয় করেছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতি হল যুক্তিবাদের উৎস। অষ্টাদশ শতকে প্রাকৃতিক নিয়মবিধি দিয়ে সমাজ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি সবকিছু ব্যাখ্যার প্রয়াস চলানো হয়।

উনিশ শতকে শিল্পায়ন এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হল আধুনিকতার নিদর্শন। একটি সমাজকে তখনই আধুনিক বলা হয় যখন কয়েকটি মূল লক্ষণ এই সমজে দৃষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ,(খ) গতিশীল সমাজ এবং নগরায়ন, (গ) অন্ধ কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তিবাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, (ঘ) বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং উন্নত প্রযুক্তি, মানবিক চাহিদা পূরণ।

20.3 অর্থনৈতিক বিকাশ

আধুনিকতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এক ধরনের আর্থিক বিকাশ যার অর্থ হল শিল্পায়নের ফলে মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি। প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে পশ্চিম ইউরোপের সমাজে কৃষিজাত উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন

ধরনের প্রযুক্তিগত উন্নতি, পশ্চিম সমাজের অগ্রগতি তরান্বিত করে যা আধুনিকতার মূল বৈশিষ্ট্য। ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে আধুনিকতা বলতে বোঝায় প্রযুক্তি এবং শিল্পে উন্নতি। একটি শক্তিশালী শিল্পায়ন দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য শুধু নিশ্চিত করে না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। অভাবনীয় ইউরোপীয় শ্রেষ্ঠত্ব, যা অষ্টাদশ শতকে শুরু হয়েছিল তা অনেকাংশে শিল্প বিপ্লবের ফলে।

Anthony Giddens সামরিকীকরণের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন—From the earlier phases of industrialisation modern processses have been put to military use, and this has radically altered ways of waging war, creating weapons and modes of military organisation much more advanced than those of non-industrial cultures.' সপ্তদশ থেকে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে পশ্চিমি দেশগুলি উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এই সব দেশগুলিতে শিল্প, গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের দ্রুত উন্নতি হয়।

20.4 ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুক্তিবাদ

ঐতিহ্যগত ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রভাব হ্রাস আধুনিকতার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ বেশির ভাগ দেশেই প্রতিষ্ঠিত ধর্মমতের বিরোধিতা করে বাস্তববোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদের বিকাশে সহায়তা করে। জ্ঞানচর্চার যুগ থেকে ইউরোপ যুক্তিবাদের যুগে প্রবেশ করেছিল। প্রধান চিন্তানায়করা হলেন ভলতেয়ার, মন্টেস্কু, রুশো, ডিডেরো ও বিশ্বকোষ গোষ্ঠী। ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, অনুমান ও সংশয়বাদ হল এ যুগের বৈশিষ্ট্য। যুক্তিবাদীরা ঐতিহ্য, বিশ্বাস, আচার আচরণকে অস্বীকার করে যুক্তিকে আশ্রয় করেছিলেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রের উন্নতি হল যুক্তিবাদের উৎস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধিক ইতিহাসের পৃথক চর্চা প্রায় কোনো দেশে ছিল না। পশ্চিম ইউরোপে এটি শুরু হয়। গণতন্ত্র ও উদারনীতিবাদ নাৎসীবাদ দ্বারা আক্রান্ত হলে কবি, শিল্পী, সাহিত্যকগণ স্বাধীনতার অর্থ অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থাপিত হয় *Journal of the History of Ideas*. এর প্রবন্ধগুলি ঐতিহাসিকদের নিকট জনপ্রিয় হয়। *Encyclopaedia of Social Sciences* এই ধারার অগ্রগতি ঘটায়। বহু যুগের বহু মানুষের চিন্তার কথা এতে স্থান পায়, বিশ্লেষণে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয়।

20.5 আধুনিকতা এবং পশ্চিম ইউরোপ : একটি সাম্প্রতিক আলোচনা

Anthony Giddens-এর মন্তব্য হল 'Modernity has a complex relationship with the west, Modernity started as a western project'. আধুনিকীকরণের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। একটি ব্যাখ্যা অনুসারে পশ্চিমি আধুনিকীকরণ এবং অবশিষ্ট-বিশ্ব গুণগতভাবে পৃথক। (Modernity of the west and the rest of the world differ qualitatively)। প্রাক্-আধুনিক থেকে আধুনিকতায় বিবর্তনের ইতিহাস পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসের মধ্যে অনেকে অনুসন্ধান করেছেন। এ বিষয়ে

পরিবর্তনগুলির মধ্যে প্রোটেস্টান্ট মতবাদ বা যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বা পুঁজিবাদের আবির্ভাব, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন অথবা অন্যান্য মহাদেশের প্রভাব ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করে আধুনিকতার আবির্ভাবের বিষয়টি আলোচনা করতে চেয়েছেন।

একটি ধারণা অনুযায়ী আধুনিকতা বলতে শুধুমাত্র আর্থিক উন্নতি বা প্রগতি বোঝায় না, ধর্মনিরপেক্ষতা আধুনিক বিশ্ব গঠনের সহায়ক। আবার অনেকের মতে আধুনিক সমাজ বলতে সামগ্রিকভাবে পশ্চিমি অনুকরণ নয়, দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বস্তুগত উন্নতির একটি সুখকর ভারসাম্য গড়ে তোলা।

ইউরোপীয় উন্নয়নের ধারা বিশ্বে বিকাশ লাভ করেছিল পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সামরিক উন্নতির মধ্য দিয়ে এবং এটি বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমি আধুনিকীকরণের বিস্তার অন্যান্য সমাজের সাংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এই সব সমাজের বুদ্ধিজীবীরা হয় পশ্চিমি আধুনিকতাকে গ্রহণ করেছিল অথবা দেশীয় মূল্যবোধ বা সংস্কৃতি গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিরোধিতা করেছিল। বলা যেতে পারে আধুনিক বিশ্ব দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম ইউরোপের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। পশ্চিম ইউরোপের শিল্পায়ন, প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য।

20.6 উপসংহার

আধুনিকতার সংজ্ঞা এবং এর বিবর্তন বিশ্লেষণ করে বেশির ভাগ সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে পশ্চিম ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থায় একটি উন্নত রূপ স্পষ্ট হয়েছিল এবং এই উন্নত সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে আধুনিকতার সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের সংযোগ স্থাপন সম্ভব। ইউরোপীয় উন্নয়নের ধারা বিশ্বে বিকাশলাভ করেছিল পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত এবং সামরিক উন্নতির মধ্য দিয়ে এবং এটি বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রাক্-আধুনিক থেকে আধুনিকতায় বিবর্তনের ইতিহাসে পশ্চিম ইউরোপে কয়েকটি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেগুলির মধ্যে ছিল যুক্তিবাদ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, পুঁজিবাদী, অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রভৃতি। Anthony Giddens সঙ্গত কারণে মন্তব্য করেছেন—'Modernity has a complex relationship with the west, Modernity started as a western project.'

20.7 নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

1. আপনি কি মনে করেন আধুনিকতা পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত?
2. আধুনিকতার সংজ্ঞা দিন। পশ্চিম ইউরোপে আধুনিকতার লক্ষণগুলি বর্ণনা করুন।

20.8 গ্রন্থপঞ্জি

1. Cengiz Dine—*Modernity and the West : Evolution of their Relationship*, Eskisehir Osmangazi University, 2007.
2. Anthony Giddens—*The Consequences of Modernity*, London, 1996.